বোধিসত্ত্ব

শ্রীজীবনকৃষ্ণ

নিবেদন

আত্মপ্রচার বিমুখ শ্রীজীবনকৃষ্ণের লেখা একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি তার এক বন্ধু একদিন তাকে ফিরিয়ে দিলেন। উনি বললেন, ‘‘থাক না ওটা তোর কাছে। তোর কাছে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তা।’’ ‘‘আমি রেখে কী করব?’— এই বলে বন্ধুটি জোর করেই সেটি জীবনকৃষ্ণের হাতে দিয়ে গেলেন। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন অনুরাগী হাতে লিখে তা নকল করে নিলেন। রক্ষা পেল আশ্চর্য এক সাহিত্যকর্ম— ‘‘বোধিসত্ত্ব’’ নামক বর্তমান নাটকটি। তাঁর লেখা নাটক ‘‘যুগধর্ম’’ কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু তার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। তার এরকম অনেক সাহিত্যকর্মই হারিয়ে গেছে তাঁরই ঔদাসীন্যে। বহু পরে ‘‘মাণিক্য’’ পত্রিকায় একটু একটু করে এটি ছাপার হরফে প্রকাশ পাওয়ায় গুণগ্রাহী পাঠকরা অজানা খনির নতুন মণিটি আবিষ্কারের আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। তাদের মিনতিভরা অনুরোধ সত্ত্বেও এতদিন এটি বই আকারে প্রকাশ করার মহান দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আর উপেক্ষা করা গেল না। ‘‘বোধিসত্ত্ব’’ প্রকাশ হল পুস্তিকাকারে। আশাকরি এবার অনেকের দীর্ঘদিনের অভিমান ঘুচবে।।

— (সঃ মঃ)

মুখবন্ধ

জরা ব্যাধি মৃত্যুর ভয়াল রূপ দর্শন করে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বিচলিত হয়ে পড়েন। স্ত্রী পুত্র রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে অমৃতপথের যাত্রী হতে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। বহু বাধা অতিক্রম করে অবশেষে গয়ার কাছে উরুবিল্ব গ্রামে নির্জন এক অশ্বত্থবৃক্ষের তলে ধ্যানমগ্ন হয়ে পরম বোধি লাভ করেন ও বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধ হন। এই কাহিনীটি আর সকলের মতোই শ্রীজীবনকৃষ্ণকেও আকৃষ্ট করেছিল। বুদ্ধদেবের ছায়া অবলম্বনে তিনি লিখলেন 'বোধিসত্ত্ব' নামে দর্শনতত্ত্ব সমৃদ্ধ একটি রূপক নাটক।

লেখক তার ৩২/৩৩ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২৫/২৬ সালে এই নাটকটি লেখেন। তখন তিনি বিলাত ফেরৎ স্যানীটরী ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কলকাতা কর্পোরেশনে কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। থাকছেন হাওরায় ৫ নং হালদার পাড়া লেনে একটু আধটু সাহিত্যচর্চা করছেন। সেই সময় নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ী, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সাথেও তার ওঠাবসা ছিল। বোধিসত্ত্ব ছাড়া ''যুগধর্ম'' নামে একটি নাটকও লিখেছিলেন যা সেকালের আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হয়েছিল। লেখক অত্যন্ত অন্তর্মুখ (introvert) ও নির্লিপ্ত হলেও যুগধর্ম সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন তার পরিচয় তার অন্যান্য লেখাতেও স্পষ্ট। তার লেখা প্রবন্ধ ''গান্ধীচরিত'' ও শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর ইংরাজী অনুবাদ স্বয়ং শরৎচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। কবি মধুসূদনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার লেখা ''মধুস্মৃতি'' কবিতাটি মধুসূদনেরই ঢঙে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। সেখানে তার কবিত্ব শক্তির অসাধারণ পরিচয় ফুটে উঠেছে। আবার অনবদ্য ভঙ্গীমায় রামকৃষ্ণ-তীর্থে গমনের অভিজ্ঞতার মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে ''তীর্থযাত্রী'' কবিতায়। ঔদাসীন্যবশত বাকী লেখাগুলির পাণ্ডুলিপির খোঁজ রাখেননি। অনেক পদাবলীও লিখেছিলেন। সেসব পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নাটকে উল্লেখিত একটি মাত্র পদাবলী— ''বঁধুয়া পরাণে তিয়াসা জাগে''— পাঠককে ওনার পদাবলী রচনার গুণমানের উচ্চতা ধরিয়ে দেয়। নাটকের বাকী গানগুলির উৎকর্ষতা তার সংগীত রচনায় অনায়াস দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরেছে। ভাষা প্রয়োগেও রেখেছেন স্বকীয়তার স্বাক্ষর, কিছু কিছু আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রয়োগ যাকে আরও সুমিষ্ট করে তুলেছে।

যাইহোক তিনি যখন বোধিসত্ত্ব লিখছেন তখন তাঁর অন্তর্জগতে চলেছে নিজের মৃত্যুঞ্জয় সত্তাকে আবিষ্কারের প্রয়াস, ভাষান্তরে মৃত্যুকে শাসন করার পথে চলেছে তার চৈতন্যের যাত্রা। আলোচ্য নাটকে একটি মানুষের ভিতরের এই পরিবর্তনকে রূপকায়িত করে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে ধনপতি শ্রেষ্ঠী নামে একজন বণিক রাজৈশ্বর্যের প্রলোভনে বন্ধ হয়ে সুবর্ণ সংগ্রহের নেশায় মত্ত। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে ভোগ বিলাসে জীবন কাটান। সহসা জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর রূপটি তার চোখে ধরা পড়ে। তার জীবনে ঘটে আমূল পরিবর্তন। জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও শেষে বিশেষ পরিণতি লাভের কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য।

এটি একটি মঞ্চ নাটক। এখানে বার্ণাড শ' প্রবর্তিত থিসীস ড্রামার (Thesis drama) অর্থাৎ কোন গবেষণার ফল সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে অভিনয় (Form and action) মুখ্য নয় বক্তব্য বিষয়ই (content) প্রধান। মাত্র ১২ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করে চৈতন্যের ধারাবাহিক গতি লাভে লেখকের অন্তর্জগতে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল সে বিষয়ে ৫০ বছর বয়সের আগে কোথাও মুখ না খুললেও সমস্ত লেখায় তা ফুটে বেরোতে চেয়েছে নানাভাবে। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুকে জয় করার ও জগতের মানুষকে মৃত্যুভয় থেকে মুক্তির পথ দেখানোর আর্তি বস্তুত লেখকেরই অন্তরের একমাত্র বাসনার অনুরণন।

ছোট পরিসরের এই নাটকে মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান ও চিরন্তন সমস্যাটি তুলে ধরে নিজ অনুভূতির আলোকে তার সমাধানের চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। অমৃতত্বলাভকারী মানুষকে অন্তরে দর্শন করে মানুষ অমৃতায়িত হয়, হৃদয়ে অনুভব করে শাশ্বত শান্তি, সহজেই ভয় থেকে অভয় লোকে উত্তীর্ণ হতে পারে, যার বাস্তব রূপায়ন শুরু হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনের ষাটের দশকের শেষ ভাগে, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে তিনি চৈতন্যময় পুরুষ হিসাবে ফুটে ওঠায়। এ নাটক তাই এক অর্থে ছিল সত্যদ্রষ্টা ঋষির ভবিষ্যদ্‌বাণী। নাট্যশিল্পের নিখুঁত কাঠামোয় সুচারু ভাষা প্রয়োগে নানান দিক থেকে আধ্যাত্মিক চেতনার যে সামগ্রিক রূপ এই নাটকে ধরা পড়েছে তা সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক।।

।। বোধিসত্ত্ব ।।

রূপক পঞ্চাঙ্ক নাটক

পাত্রগণ

ধনপতি শ্রেষ্ঠী	—	বণিক
মন	—	ধনপতির বন্ধু
সংস্কার	—	ঐ ভৃত্য
রাহুল	—	ঐ পুত্র
রাজা প্রলোভন	—	ঐ শ্বশুর
মিথ্যা	—	বৈদ্য
আনন্দগিরি	—	ধনপতির গুরু

কল্পতরু, বোধিসত্ত্ব, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, প্রৌঢ়, যুবকদ্বয়, নাগরিকগণ, ছাত্রগণ ইত্যাদি

পাত্রীগণ

রত্না	—	ধনপতির স্ত্রী
শর্ম্মিষ্ঠা	—	ধনপতির কন্যা
কুচিন্তা	—	ঐ দাসী
সুমতি	—	মনের স্ত্রী
কুমতি	—	ঐ
বিদ্যা	—	ধনপতির আচার্য্য-কন্যা

আশা, নর্তকীবৃন্দ, বনবালাগণ, প্রৌঢ়া ইত্যাদি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি

বোধিসত্ত্ব

রূপক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রী জীবনকৃষ্ণ ঘোষ

মাণিক্য

১২/১বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন,

কলকাতা ৭০০ ০০২

প্রকাশক ঃ
মাণিক্য
C/O. অরুণ ঘোষ
১২/১বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন
কলকাতা ৭০০ ০০২

ISBN : 978-81-906999-4-5

প্রথম প্রকাশ ঃ
৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
২২শে মে, ২০০৯

বর্ণ সংস্থাপনে ঃ
শঙ্কর প্রসাদ দাস
১৭/১/৩৭, বিধান নগর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

মুদ্রণে ঃ
দেবী অফ্‌সেট প্রাঃ লিঃ
১৩ম, আরিফ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

প্রচ্ছদ চিত্রায়ণ ঃ
শ্রী তন্ময় নাথ
২৬, রজনী ব্যানার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৮

মূল্য ঃ ১৫ টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

২) মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১২

৩) পবিত্র দত্ত
ভুবনমোহন রায় রোড
বড়িশা, কলকাতা - ৭০০ ০০৮
দূরভাষ - ০৩৩২৪৪৭৩৪৬৩

৪) নির্মলচন্দ্র মণ্ডল
এ-৯/৫৯, কল্যানী, নদীয়া
দূরভাষ - ৯৮৩১০৭৭০৪২

৫) শ্রী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরধাম
১/১ কালী ব্যানার্জী লেন
হাওড়া - ১

৬) শ্রীধর ঘোষ
বোলপুর, বীরভূম
দূরভাষ - ০৩৪৬৩২৫৫৩৭৬

৭) অসীম বিশ্বাস
৭/৭, প্রিয়নাথ ঘোষ লেন
হাওড়া - ৪
দূরভাষ - ৯৪৩২৬৪৮৫৭৪

প্রথম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(স্থান—শ্রেষ্ঠী ধনপতির উদ্যান। সিংহাসনে বসিয়া শ্রেষ্ঠী ধনপতি, পার্শ্বে তাহার বন্ধু মন দাঁড়াইয়াছিল। নর্তকীবৃন্দ নৃত্য করিয়া গাহিতেছিল)

এ যে ফুরফুরে হাওয়া। মাতাল করে প্রাণে আমার
মুখপানে চাওয়া।
চামেলি সে আড় নয়নে চায়। ঘোমটা তোল ওগো-বঁধু
(এ যে) প্রাণের পথে পাওয়া।
সরম যদি মুদে নয়ন মরম কথা কইবে তখন।
ভাবনা কিসের ওগো প্রিয়
বইছে দখিন হাওয়া।।

(প্রণাম করিয়া নর্তকীগণের প্রস্থান।)

(ধনপতি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। ধনপতির হাতে একখানি হিসাবের কাগজ। সে কাগজের দিকে তাকাইয়া বলিল।)

ধনপতি — প্রচুর সুবর্ণরাশি সংগ্রহ করা গেছে। কি বল বন্ধু মন?

মন — হ্যাঁ, তা স্বীকার করতেই হবে। সুবর্ণরাশি প্রচুর।

ধনপতি — পিতামহ একটি মাত্র স্বর্ণ পাহাড় সঞ্চয় করেছিলেন, আর পিতা সেই একটি মাত্র স্বর্ণ পাহাড়কে আটটি স্বর্ণ পাহাড়ে পরিণত করেন। আমি কিন্তু সেই আটটি স্বর্ণ পাহাড়কে চল্লিশটি স্বর্ণ পাহাড় করে তুলেছি— এ বিষয়ে আমার বাহাদুরি আছে।

মন — বাহাদুরি বলে বাহাদুরি! যেন ব্রহ্মাণ্ডের মতন প্রকাণ্ড একটা বাহাদুরির পেছনে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিয়েছে— এই ঠিক যেমন ছুটোছুটি করে মানুষের পিছনে ছায়া।

ধনপতি — শ্রেষ্ঠী ধনপতি, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী, এ বিষয়ে কেউ কিছু সন্দেহ করে?

মন — মানুষের সন্দেহের বহু উচ্চে শ্রেষ্ঠী ধনপতির সুবর্ণ সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠত্ব— সিংহাসন স্থাপন করে বসে আছে। এ কথা মিত্র যারা তারা বলে, আর শত্রু যারা তারা মাথা পেতে গ্রহণ করে — এই যেমন নিদাঘের মধ্যাহ্নে তরুহীন প্রান্তরে নিরাশ্রয় পথিক সূর্যের প্রখর কিরণধারা মাথা পেতে নেয়।

ধনপতি — আহা! পথিক যে তখন নিরুপায়।

মন — এও যে ঠিক সেই রকম—মানুষ্যজাতি নিরুপায়। অতএব তারা ধনপতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য।

ধনপতি — ঠিক বলেছ বন্ধু মন— খাঁটি কথা বলেছ। মনুষ্যজাতি ধনপতি শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে সুবর্ণ সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে তবে আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে।

মন -— শ্রেষ্ঠী মহাশয়। এবার একটা রাজমুকুট মাথায় নিলে কিরকম হয়?

ধনপতি — হাঃ হাঃ হাঃ। বন্ধু মন— এতক্ষণ পরে তুমি আমায় হাসিয়েছ। রাজ-মুকুট। ভারতবর্ষের এমন কোনও রাজমুকুট আছে যেটি আমার কাছে অধমর্ণ নয়? তারই একটা মাথায় তুলে নিলে আমার গৌরব বাড়বে কি?

মন — না, গৌরব বাড়ার আশা তাতে খুব কম।

ধনপতি — আমার এই সুবর্ণ সংগ্রহ সংগ্রামের বরঞ্চ সেটা একটা বিঘ্ন।

মন — নিশ্চয়ই। সেটা একটা বড় রকমের বিঘ্ন তা স্বীকার করতেই হবে।

ধনপতি — আমি যদিও রাজা নই, কিন্তু আমার স্ত্রী রাজকন্যা। শুধু রাজকন্যা নয়—সাধ্বী, পতিপরায়ণা ও ভারতবর্ষের ললনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপসী বলে পরিচিতা। সেও আমার গর্বের বিষয়।

মন — নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে কি অণুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে? আপনার স্ত্রী, একে রাজার মেয়ে তার উপর সাধ্বী, আবার পতিপরায়ণা— আবার তার উপর শ্রেষ্ঠ রূপসী। শ্রেষ্ঠী মহাশয়, রাবণ রাজার ভাগ্যেও এরকম জোটেনি।

ধনপতি — পুত্র কন্যা সকলেই পিতৃবৎসল .....

মন — বৎসল বলে বৎসল। এই দেশী কথায় যাকে বলে স্বচ্ছল। যতদিন সোনার পাহাড় আছে তারা কখনও হবে না অচল।

ধনপতি — তার উপর শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ দান—আমার এই অনবদ্য স্বাস্থ্য, বাহুতে অপরিসীম শক্তি, হৃদয়ে যৌবনের অনন্ত আশা, ললাটে প্রতিভার জাজ্জ্বল্যমান চিহ্ন— চক্ষুতে ভবিষ্যৎ সাফল্যের গরিমার ঔজ্জ্বল্য আর তার উপর সমস্ত অঙ্গব্যাপী স্বাস্থ্যের লাবণ্যধারা বয়ে যাচ্ছে।

(বেগে ব্যাধির প্রবেশ)

ব্যাধি — শ্রেষ্ঠী মহাশয়। আপনার ঐ স্বাস্থ্যের পিছনে আমার স্থান।

ধনপতি — এ্যাঁ ..... এ্যাঁ ..... এ্যাঁ ..... কে তুমি? কি ভয়ঙ্কর তোমার মূর্তি।

ব্যাধি — হাঃ ..... হাঃ ..... হাঃ .....। আমার পরিচয় চান শ্রেষ্ঠী মহাশয়? ঐ আকাশকে জিজ্ঞাসা করুন— সে বলে দেবে আমার পরিচয়।

ঐ ধরিত্রীকে প্রশ্ন করুন সেও আমার পরিচয় দেবে, আর ঐ অনন্ত বারিরাশি বক্ষে ধারণ করে আছে যে স্বেচ্ছাচারী সমুদ্র, ওকেও জিজ্ঞাসা করুন— সেও অট্টহাস্যে আমার পরিচয় দিয়ে জগতকে সশঙ্কিত করে তুলবে— আমি সর্বজনবিদিত ব্যাধি।

ধনপতি — তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ?

ব্যাধি — সম্বন্ধ আছে বৈকি শ্রেষ্ঠী মহাশয়, বেশ গাঢ় নিকট সম্বন্ধ। আমি যে একদিন আপনার দেহ মন্দির অধিকার করব।

ধনপতি — বন্ধু মন— এসব কি সত্যি?

মন — তা ব্যাধি মহাশয় যেরূপ বলছেন, তাতে বোধ হচ্ছে— এসব সত্য।

(বেগে জরার প্রবেশ)

জরা — আর ব্যাধির পেছনে আসবো আমি।

ধনপতি — তুমি! তুমি! কে তুমি! কি কদর্য তোমার প্রতিকৃতি। যেন সমস্ত জগতের কদর্যতা স্তূপীকৃত করে তোমার সৃষ্টি।

জরা — হাসালেন শ্রেষ্ঠী মহাশয়— আপনি আমায় হাসালেন। আমার কদর্য্য প্রতিকৃতি না হলে আপনার ঐ দেহমন্দিরকে কদর্য্যে পূর্ণ করবো কি করে? আপনার ঐ দেহমন্দিরে আমি এমন কদর্যতা লেপন করবো— যা দেখলে মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠবে।

ধনপতি — মহাশয়ের পরিচয়টা জানতে পারি কি?

জরা — পরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন— তবে পরিচয় গ্রহণ করুন। আমি আপনার কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ তুষার শুভ্র করবো। ললাটের ঐ উজ্জ্বল প্রতিভার চিহ্ন হরণ করে ম্লানময়ী কালিমা লেপন করবো। আমারই কঠিন স্পর্শ আপনার ঐ নয়নকে করবে নিষ্প্রভ। হৃদয়ের সমস্ত মধুময় আশা লুপ্ত হয়ে গিয়ে এক বিরাট হাহাকারের সৃষ্টি করবে, চর্ম শিথিল হবে— দেহযষ্টি ভেঙ্গে নুয়ে পড়বে, আপনার অত সাধের নিজ হাতে গড়া দেহমন্দির ভেঙে চুরমার হয়ে প্রেতের আবাস হবে। আমি ত্রিভুবনের ত্রাসোৎপাদনকারী জরা।

ধনপতি — বন্ধু মন, এ কি সত্যি?

মন — জরা মহাশয় যখন অত আস্ফালন করে বলছেন, তখন সত্য বলেই বোধ হচ্ছে।

(বেগে মৃত্যুর প্রবেশ)

মৃত্যু — আর তারপরে আসবো আমি।

ধনপতি — আবার তুমি! তুমি আবার কে?

মৃত্যু — আমি প্রাণীজগতের অধিপতি। একদিন সকলকে এসে আমার

পায়ে মাথা নোয়াতে হবেই হবে। ব্যাধি এসে আমার রাস্তা প্রস্তুত করে, জরা এসে আমার সিংহাসন পেতে দেয়, আর আমি যখন সেই সিংহাসনে বসি— তখন সবাই লুকিয়ে পড়ে— কোথায় যে লুকিয়ে পড়ে তার আর কোন সংবাদ থাকে না।

ধনপতি — কে মশাই আপনি? আপনার ঐ বিভীষিকাময় মূর্তি দেখে আমার প্রাণটার ভেতরটা আঁকড়-পাঁকড় করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

মৃত্যু — আমি মৃত্যু — আমারই দুর্বার আলিঙ্গনে কত হাস্যময়ী নগরী লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কত শক্তিশালী জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; কত প্রাণময় পুরুষ অন্ধকারের অন্তরেতে চলে গিয়েছে, কত প্রেমময়ী ললনা ঝরা ফুলের মতো শুকিয়ে গিয়েছে— পুষ্পস্তবকের মতন কত শিশু মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আর সকলকার চেয়ে মজা হচ্ছে আমার এই গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে কেউ জানতে পারে না— এই অন্ধকার রাজ্যের একটিমাত্রও সংবাদ।

ধনপতি — বন্ধু মন, মৃত্যু মশাইয়ের কথা কি সত্য?

মন — খাঁটি নির্জলা সত্য। প্রমাণ চান শ্রেষ্ঠী মহাশয়? এই ধরুণ আপনার পিতামহের বাবা আর আমার পিতামহের বাবা-দুজনের কেউই বেঁচে নেই। মৃত্যু মহাশয় ধরে নিয়ে গেছেন।

ধনপতি — মৃত্যু মহাশয়, আমায় আপনি রেহাই দিতে পারেন না?

মৃত্যু — মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই চান শ্রেষ্ঠী মহাশয়? হাঃ হাঃ হাঃ। সকলেই রেহাই চায় বটে, কিন্তু কেউ রেহাই পায় না।

ধনপতি — মৃত্যু মহাশয়। মৃত্যু মহাশয়। আমি আপনাকে একটা সোনার পাহাড় দিচ্ছি।

মৃত্যু — জগতের সমস্ত সুবর্ণরাশি এক সঙ্গে জড়ো করে দিলেও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

ধনপতি — বন্ধু মন, মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কী? একটা লম্বা ছুট দিয়ে গভীর অরণ্যে লুকিয়ে পড়বো?

মৃত্যু — পরিত্রাণ নেই শ্রেষ্ঠী মহাশয়! পরিত্রাণ নেই! আপনার প্রতিটি পদক্ষেপকে মৃত্যু অনুসরণ করবে।

ব্যাধি — মনে রাখবেন শ্রেষ্ঠী মহাশয়— আগে ব্যাধি।

জরা — তারপর জরা

মৃত্যু — আর তারপর মৃত্যু।

ধনপতি — আমায় পরিত্রাণ করো, পরিত্রাণ করো বন্ধু মন! এই ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে আমায় পরিত্রাণ করো।

মৃত্যু — উপায় নেই শ্রেষ্ঠী মহাশয়, উপায় নেই, আমরা এখন চল্লুম। ঠিক সময়ে আবার আমাদের দেখতে পাবেন।

(ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর প্রস্থান)

ধনপতি — পরিত্রাণ, পরিত্রাণ— ওগো কে আছ কোথায়, আমায় ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ করো।

(ধীরে গান গাহিয়া আশার প্রবেশ)

আশার গান — আমার প্রাণের আঙ্গিনাতে
তোমার ছবি দেখিনু প্রাতে।
প্রেম দরিয়া উথলে উঠে ভাসিয়ে নিলো উজানেতে।
শেফালী সে ঝরা ফুলে হেসে মালা দিলো গলে।
সে পরশে হরষ মিলে ওগো বঁধু দু'জনাতে।
সাঁঝের বেলায় এক তরীতে বাজে প্রাণ যে একতারাতে।
রাঙা রবির রঙের খেলা দিক্‌হারা ঐ কিনারাতে।।

ধনপতি — তুমি আবার কে? কে তুমি?

আশা — আমি আশা।

ধনপতি — আমায় পরিত্রাণ করতে পারো? পরিত্রাণ করতে পারো ঐ ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে?

আশা — আমি তোমায় পরিত্রাণ করতে পারবো না— কিন্তু এই পথহারা জীবনপথে যখন আশার আলোর প্রয়োজন হবে— তখন আমায় দেখতে পাবে।

ধনপতি — ওগো আমায় বাঁচাও, ঐ ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে আমায় বাঁচাও।

আশা — অধৈর্য্য হয়ো না। ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় স্থির হয়ে চিন্তা করো।

ধনপতি — অধৈর্য্য হবো না, বলছো কী? কী জঘণ্য, কী কুৎসিত, কী ভয়ঙ্কর এই ব্যাধি, জরা-মৃত্যু! তুমি যদি ওদের দেখতে!

আশা — যাও, চিন্তা করগে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়।

ধনপতি — (মনের হাত ধরিয়া) এস বন্ধু মন, চলে এসো। চিন্তা করিগে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়।

(এক দিক দিয়া ধনপতি ও মন এবং বিপরীত দিক দিয়া আশার প্রস্থান)

(প্রথম অঙ্ক— প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত)

প্রথম অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(স্থান — মনের গৃহ)

সুমতি গাহিতেছিল—

যৌবন জীবনে তুলেছে তুফান,
সামাল সামাল তরী, স্রোতে বড় টান।।
ভেসে যাই, ভেসে যাই, কুল নাহি পাই,
কোথায় চলেছে তরী, আকুল পরাণ।।
ঐ যে রঙিন দেশে, চলো তরী যাই ভেসে,
সোনালী কিরণ হেসে, পরশে জুড়াবে প্রাণ।।

(কুমতির প্রবেশ)

কুমতি — বলি হ্যাঁ লো, তুই স্বামীর সংসার করতে এসেছিস, না ফুরফুরে প্রজাপতির মতন ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াতে এসেছিস। ও মা, এর ওপর আবার গুণগুণে মৌমাছির মতন গুণ গুণ করে গান। বলিহারি যাই তোর আক্কেলকে।

সুমতি — আহা, দিদি, তুমি থাকতে আমাকে ঘর সংসারের কাজ দেখতে হবে?

কুমতি — তা বৈকি! আমি থাকতে ওকে ঘরকন্নার কাজ দেখতে হবে! আমি ওর কেনা বাঁদি থাকতে এও কি কখনও হতে পারে! উনি শুধু হিঙুল রঙের টসটসে কথা বলবেন, আর সোঁদাল ফুলের মতন হাসি হেসে স্বামীর মন ভোলাবেন!

সুমতি — আহা দিদি! তুমি হলে আমার বড় বোন। তুমি থাকতে আমায় সংসার দেখতে হবে কেন?

কুমতি — ওসব ন্যাকামো রেখে দে সুমতি, সতীন আবার কখনও বোন হয়? আরে আমার দুলালী বোন রে! ঘর সংসারের কাজ চুল চিরে অর্ধেক যদি তুই না করিস তখন দেখতে পাবি এই কুমতি কেমন কুলুক্ষেত্তোর সৃষ্টি করে।

সুমতি — দেখ দিদি, কুলুক্ষেত্তোর এখনও কেউ সৃষ্টি করতে পারে নি। কুরু-পাণ্ডবে যুদ্ধ করে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল।

কুমতি — ঝ্যাঁটা পেটা করি আমি সতীনের মাথায়। আমার কথায় ভুল ধরা হচ্ছে।

সুমতি — দিদি তুমি রাগ করছ কেন? তোমার ভুল হচ্ছিল, তাই ঠিক করে দিচ্ছিনু। পাড়ার পাঁচজনে ও কথা শুনলে হাসতে পারে।

কুমতি — আমার কথায় পাড়ার পাঁচজন হাসবে? বটে, এতদূর আস্পর্ধা।

আচ্ছা, আজ কর্তা আসুক। তোকে যদি এ বাড়ী থেকে না তাড়াই তাহলে আমার নাম কুমতিই নয়।

সুমতি — দিদি, দিদি তুমি রাগ কোর না— তোমার পায়ে পড়ি। তোমায় এখুনি একটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি।

(সুমতি গাহিল)

সরল বাঁশের বাঁশি বাজে উভরায়,
ও ধ্বনি মরমে গেলে কুল রাখা দায়।।
যত ভাবি না শুনিব বাঁশরীর ধ্বনি,
মন মাঝে সুর বাজে প্রমাদ যে গণি।।
বাঁশরী মিনতি তোরে বাজিস না আর
ছুটে এসে বুকে পড়ে মিশাবে হিয়ায়।।

(গানের মধ্যভাগে মন প্রবেশ করিয়াছিল)

কুমতি — এই যে। এসে চোরটির মতন দাঁড়িয়ে আছেন। গান শুনে যেন একদম প্রাণছাড়া হয়ে গেছেন। (মনের নিকট গিয়া হাত ধরিয়া) ওসব ন্যাকামী রেখে দাও— এখন ঘরবাড়ীর একটা ব্যবস্থা করো। হয় এখানে সুমতি থাকুক, আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাই— আর তা নইলে আমি থাকি, সুমতি চলে যাক।

মন — দেখ, আমায় বিরক্ত কোর না বলছি। আমি বড় চঞ্চল হয়ে আছি বন্ধু ধনপতির জন্য।

কুমতি — আহা। যেমন উনি, আর বন্ধুও জুটেছে ঠিক তেমনি। এমন সোনার সংসার দেখলে দেবরাজ ইন্দ্রের লোভ হয়। রত্নার মতো অমন স্ত্রী— রাজার মেয়ে; রাহুলের মতো ছেলে আর শর্মিষ্ঠার মতন মেয়ে— তার ওপর আবার কাঁড়িকাঁড়ি সোনা। এ সব নিয়ে কোথায় খাবিদাবি, ফুর্তি করবি— তা নয়, কেবল হচ্ছে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর চিন্তা।

সুমতি — সত্যই তো, অমন সুন্দর দেহ ব্যাধিগ্রস্থ হবে, জরা এসে সেই দেহকে কুৎসিৎ করবে— শেষে মৃত্যু এসে কোন অজানা দেশে নিয়ে চলে যাবে— এর প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

কুমতি — (মনের প্রতি) দেখছ! দেখছ! আমি যা বলব— অমনি উনি তার উল্টো গাইতে আরম্ভ করবেন। এও কি কখনও মানুষের সহ্য হয়।

সুমতি — তুমি রাগ করছ কেন দিদি? আমি তো ভাল কথাই বলছি।

কুমতি — কত ভাল কথা হলো, আর কত ভাল কথা গেল— আজ উনি এসেছেন আমায় ভাল কথা শোনাতে।

সুমতি — ভাল কথা যদি একান্তই না শুনতে চাও, তবে দূরে গিয়ে থাকতে পার।

কুমতি — (মনের প্রতি) দেখলি! দেখলি রে মুখপোড়া! তোর সামনে কালকের ছুঁড়ি সুমতি আমায় দূর দূর ক'রে তাড়াচ্ছে! আর মুখপোড়া ঠুঁটো গঙ্গারাম হয়ে তাই দেখছেন।

মন — সুমতি কোন অন্যায় কথা তো বলেনি।

কুমতি — তবে রে মুখপোড়া— সুমতি অন্যায় বলেনি— আর যত অন্যায় বলেছি আমি। সুমতির কাঁচা বয়স কিনা— তাই তার মন যোগানো হচ্ছে।

সুমতি — তোমার এতখানি বয়স হলো দিদি, তবু তোমার একটু জ্ঞান হলো না। পতি পরম গুরু, তাকে কিনা ঐ রকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

কুমতি — উঃ! আমায় পতি পরম গুরু দেখাতে এসেছেন। তোর কি লা? আমার স্বামী, আমার যা ইচ্ছা হবে, তাই করব।

সুমতি — স্বামী তোমার একলার নয়, স্বামী আমারও বটে।

কুমতি — আচ্ছা দাঁড়া, দেখাচ্ছি কার স্বামী— (বেগে প্রস্থান এবং ঝাঁটা লইয়া প্রবেশ) আজ মুখপোড়াকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়ব।

(বেগে সংস্কারের প্রবেশ। সংস্কার ক্ষিপ্রগতিতে কুমতির হাতের ঝাঁটা ধরিয়া ফেলিল।)

সংস্কার — আহা ঠাকরুণ এমন কাজ করবেন না, করবেন না-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মঙ্গলবার, একাদশী তিথিতে ঝাঁটা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন, পাঁজি খুলুন—সুবর্ণ অক্ষরে লেখা আছে দেখবেন—ঝাঁটা ভোজন নিষিদ্ধ। ভাগ্যিস এলুম— তা নইলে একটা মস্ত বড় অশাস্ত্রীয় কাজ হয়ে যাচ্ছিল।

মন — তোমার প্রভুর কী সংবাদ, সংস্কার?

সুমতি — ধনপতি শ্রেষ্ঠী মহাশয় ভাল আছেন তো?

কুমতি — এখানকার কোন কথা যেন শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে বোল না।

সংস্কার — আপনারা একটু অপেক্ষা করুন— আমি এক এক করে উত্তর দিচ্ছি। (কুমতির প্রতি) ঠাকরুণ, আপনি বড়, অতএব আপনাকে নিয়ে শুরু করি। আমার এই তিন কুড়ি সাত বয়স হলো বটে, তবে আমি এখনও এত তরল হইনি যে, এখানকার কথা সেখানে গিয়ে বলব। (সুমতির প্রতি) এবার আপনার পালা। তিনি ভাল আছেন কি খারাপ আছেন তা নির্ণয় করা আমার সাধ্য নয়, দ্বিতীয় বেদব্যাসের আবশ্যক। তবে একটা মোটা কথা বলি, যদি কলেবর বৃদ্ধি হওয়া ভালর লক্ষণ হয়

তাহলে তিনি ভালই আছেন, আর যদি মন্দের লক্ষণ হয় তাহলে তিনি খারাপ আছেন। (মনের প্রতি) এবার ফুরসৎ পেয়েছি— আপনার কথার জবাব দিই। আমার প্রভু অর্থাৎ আপনার বন্ধু ধনপতি শ্রেষ্ঠী মহাশয় আপনাদের তিনজনকেই স্মরণ করেছেন। রথ প্রস্তুত— বাইরে অপেক্ষা করছে, আপনাদের এখনই যেতে হবে।

মন — (সুমতি ও কুমতির প্রতি) চল, চল এখনই চল।

সুমতি — শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের যাতে শান্তি হয়, সে চেষ্টা করা উচিত।

কুমতি — এবার শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে দিয়ে তোমার গ্যাদা ভাঙ্গাব।

সংস্কার — আসুন, আসুন, চলে আসুন, (সকলের প্রস্থান)

(প্রথম অঙ্ক — দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত)

প্রথম অঙ্ক

—তৃতীয় দৃশ্য—

(স্থান—ধনপতি শ্রেষ্ঠীর প্রমোদকুঞ্জ। ধনপতি ও রত্না সিংহাসনে বসিয়াছিল। সখীরা গাহিতেছিল)

ওগো বঁধু মুখটি তুলে চাও।
মুখের কথা চাইনা তোমার
আঁখির কথা দাও।।
আঁখির কথা মরমেতে, আঁকবে ছবি প্রাণের পটে।
নিরালা এ জীবন পথে, আঁখি তুলে চাও।।
ব্যথা যদি পাও গো সখা, চাইনা তোমার চোখের দেখা
প্রাণের মাঝে লুকিয়ে রাখা, দুঃখের গানটি গাও।।

(নমস্কার করিয়া সখীগণের প্রস্থান)

ধনপতি — (বেড়াইতে বেড়াইতে চিন্তামগ্নভাবে) এই মর্মস্পর্শী সংগীত-কাকলির ন্যায় সুরলহরী তুলে নববসন্তের তরল জ্যোছনার মুর্ছনায় নিজেকে আবৃত করে কোন অজানা আনন্দের দেশে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে শান্তি, তৃপ্তি, স্বাচ্ছন্দ্য কল্পলোকের সৃষ্টি করে মানুষকে বুকের মাঝে জড়িয়ে রাখতে চায়। রত্না! রত্না! সেখানে কি ব্যাধি, জরা-মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে?

রত্না — স্বামী, প্রভু, দেবতা আমার! বলে দিন আমায়, কী করলে আপনি ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন?

ধনপতি — উপায় নেই রত্না, উপায় নেই। তুমি তোমার গোলাপের ন্যায়

রূপরাশি দিয়ে আমায় মুগ্ধ করেছিলে। তোমার প্রেম স্বচ্ছসলিলা প্রস্রবনের ন্যায় আমার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে দিয়েছিল। তোমার ভালবাসা প্রভাত কেতকীর নির্মাল্যে আমার জীবনে তৃপ্তি এনেছিল। তোমার সেবা মূর্তিমতী দয়ার ন্যায় আমার জীবনকে সুধাসিক্ত করেছিল। কিন্তু সবই বৃথা রত্না, সবই বৃথা।

রত্না — আর্যপুত্র, অত উতলা হবেন না, তাহলে এই সাধের সংসার ডুবে যাবে।

ধনপতি — ডুববে বৈকি— সব ডুবে যাবে। দেখ-দেখ, দেখ রত্না, ঐ মৃত্যু আসছে। কী বিশাল তার দেহ, যেন সমুদ্রের চেয়েও বিশাল। কী গাঢ় অন্ধকার তার গায়ের রঙ। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ এই পর্যন্ত মনুষ্যজাতির ঐ অন্ধকার ভেদ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কী কঠিন নির্ম্মম মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। কী ভয়ঙ্করী তার ক্ষুধা! অনাদিকাল থেকে সে খেয়েই আসছে। তবু তার ক্ষুধার তৃপ্তি হলো না। রত্না, রত্না, তোমাকেও সে গ্রাস করবে— আমাকেও গ্রাস করবে, ছাড়বে না, ছাড়বে না! মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই মিলবে না।

রত্না — আর্যপুত্র, সকলেই মরে— আমরাও মরব। এতে আর অস্থির হ'লে কি হবে!

ধনপতি — অস্থির হব না! কী বলছ রত্না! অস্থির হব না! মৃত্যু আসবে আর ধরে নিয়ে যাবে আর নীরবে সেই অত্যাচার সহ্য করতে হবে? না, তা হবে না, মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রতিকার চাই, প্রতিকার চাই!

(রাহুলের প্রবেশ)

রাহুল — বাবা, বাবা আমার পক্ষীরাজ ঘোড়া চাই। তুমি আমায় পক্ষীরাজ ঘোড়া এনে দেবে বলেছিলে, কই নিয়ে এলে না তো?

ধনপতি — রাহুল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে গেলেও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করবে।

রাহুল — না— না তোমার ও কথা আমি শুনতে চাই না। পক্ষীরাজে চেপে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করব।

রত্না — আর্যপুত্রকে এখন বিরক্ত করো না। আমি তোমায় পক্ষীরাজ এনে দেব।

রাহুল — না, না মা, তুমি পারবে না। বাবা না হলে কেউ পক্ষীরাজ আনতে পারবে না।

(শর্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্মিষ্ঠা — বাবা, আমি কেমন নতুন গান শিখেছি তুমি শোন। (শর্মিষ্ঠা নাচিতে নাচিতে গাহিল)

ওরে আমার পোষা পাখি
বলনা তোরে কোথায় রাখি।
প্রাণের দোলায় দুলবি কিরে, ঢেউ তুলে ঐ মলয় আসে।।
আকাশেতে উড়ে গেলে,
চেয়ে থাকি আপন ভুলে।
ঘুরে ঘুরে ফিরে এলে প্রাণের বাঁধন বাঁধব কষে।
ফুলের হাসি চাস যদি রে,
আমার হাসি নে না ধরে।
হাসির ফাঁদে ধরব তোরে, রেখে দেব আঁখির পাশে।।

রাহুল — দিদির কেবল নাচ আর গান। ওর চেয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে, কেমন— উড়ে উড়ে বেড়ানো যায়।

শর্মিষ্ঠা — সত্যিকারের কিন্তু পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই।

রাহুল — মা, মা, দেখনা, দিদি বলছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া সত্যিকারের নয়।

রত্না — সত্যিকারের পক্ষীরাজ ঘোড়া কি কখনও হয়!

রাহুল — না, না আমি তোমাদের কথা শুনতে চাই না। বাবা আমায় পক্ষীরাজ ঘোড়া এনে দেবে বলেছে। বাবা, একবার পক্ষীরাজ ঘোড়াটি আমায় এনে দাওনা, আমি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গিয়ে রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে আসি।

ধনপতি — এই সংসার সুখের কল্পলোক সৃষ্টি করেছে। পত্নীর প্রগাঢ় প্রেম জীবনকে রজনীগন্ধার গন্ধে মাতিয়ে রাখে। পুত্র-কন্যার এই নির্ভরতা জীবনকে স্নেহরসে সিক্ত করে তোলে, তার ওপর আত্মশক্তি সকলকে পরাজিত করে জগতের মাথা নুইয়ে ধরে। কিন্তু, তবুও মৃত্যু আসবে। সে কঠিন নির্মম হাতে এই আনন্দময় সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন অজানা দেশে চলে যাবে। আমার প্রাণের সহস্র অনুনয় সে কানেও তুলবে না। না, না, রত্না আমি মৃত্যুর প্রতিকার চাই।

(ধনপতির শ্বশুর রাজা প্রলোভনের প্রবেশ)

প্রলোভন — প্রলোভন যে রাজ্যের রাজা, সে রাজ্যে সব জিনিসের প্রতিকার আছে।

ধনপতি — আসুন শ্বশুর মশাই। প্রণাম হই।

প্রলোভন — মৃত্যুর প্রতিকার চাও বৎস? প্রতিকার মিলবে। শুধু একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। কথায় বলে— মানুষ, বনের বাঘ যাকে দেখলে ছুটে পালায়, পাহাড়ের সাপ যাকে দেখলে গর্তে লুকায়, জলের কুমির যাকে দেখলে জলের ভেতর ভয়ে ডুব দেয়, তার সঙ্গে চালাকি! মৃত্যু আসে আসুক না, একবার দেখে নিই তাকে।

ধনপতি — শুধু মৃত্যু নয় রাজা। আগে আসে ব্যাধি, সে এই দেহের দৃঢ়তা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। তারপর আসবে জরা, সে এই দেহকে জীর্ণ করবে, আর, সকলের শেষে আসবে মৃত্যু— সে জীবনসমুদ্রের অপর পারে কোন গাঢ় অন্ধকারময় দেশে নিয়ে চলে যাবে— যে দেশের সমস্ত সংবাদ মনুষ্যজাতির অজ্ঞাত।

প্রলোভন — কিছু ভেবো না বাবাজী। আমিও সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। আমি বৈদ্যরাজ মিথ্যাকে ডেকে এনেছি। সে এল বলে।

(বৈদ্যরাজ মিথ্যার প্রবেশ)

রত্না — বৈদ্যরাজ, বৈদ্যরাজ— আপনি আর্যপুত্রকে নিরাময় করুন।

মিথ্যা — হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি নিরাময় করতেই তো এসেছি। বাবাজীর রোগ নির্ণয় করে ঔষধ সঙ্গে নিয়ে তবে আমি এসেছি।

প্রলোভন — কী রোগ নির্ণয় করলেন বৈদ্যরাজ মিথ্যা?

মিথ্যা — বায়ুরোগ।

রত্না — প্রতিকার?

মিথ্যা — প্রতিকার সঙ্গেই আছে মা। (ঔষধ দেখাইয়া) প্রভাতে এই কুক্কুট নিম্ব-ডিম্ব গুটিকা ভক্ষণ, আর তার সঙ্গে এই জরাসিন্ধুবধ তৈলমর্দন—ব্যস। বায়ুরোগের একদম ধ্বংস হওন।

ধনপতি — (অসি নিষ্কাশন করিয়া মিথ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া) আর সেই সঙ্গে তোমারও শ্রাদ্ধের আয়োজন।

(রত্না ধনপতিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল)

মিথ্যা — উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

ধনপতি — আজ মিথ্যাকে ধ্বংস করে তবে আমার অন্য ব্যবস্থা।

(ধনপতি বৈদ্যরাজ মিথ্যাকে তাড়া করিল এবং উভয়ের প্রস্থান)

রত্না — বাবা, বাবা, আর্যপুত্র উন্মাদ হয়ে গেলেন।

শর্মিষ্ঠা — দাদামশাই—তাইত, তাইত, আমার পোষা পাখি উড়ে গেল।

প্রলোভন — আয় মা রত্না, জামাইয়ের চিকিৎসার আয়োজন করিগে।।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক — তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত

প্রথম অঙ্ক

—চতুর্থ দৃশ্য—

(স্থান— শ্রেষ্ঠী ধনপতির শয়ন মন্দির। সংস্কার দাঁড়াইয়া কীর্তন গাহিতেছেন।)

(গান)

আমার সোনার গৌরাঙ্গ হে
(কবে) গৌর স্মরিয়া করোয়া লইয়া
পথেরি মাঝারে দাঁড়াব হে।
গৌর মুরতি হৃদয়ে থুইয়া।
গৌর পিরীতি অঙ্গেতে মাখিয়া
নদীয়ার পথে লুটাব হে।
যেতে বৃন্দাবন যাব নীলাচল
নীলাচলপতি হেরিব হে।
গম্ভীরা যাইব রসেতে ভাসিব
গৌর চরণে মিশাব হে।

(বেগে কুচিন্তার প্রবেশ)

কুচিন্তা — তবে রে মুখপোড়া। এইখানে দাঁড়িয়ে গৌর গৌর করা হচ্ছে। আর আমি মুখপোড়াকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সংস্কার — তুই মুখ্যু কিনা, তাই চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস।

কুচিন্তা — আর মুখপোড়া আমার দিগ্‌গজ পণ্ডিত কিনা— তাই এখানে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো গলা ছেড়ে চিৎকার করা হচ্ছে!

সংস্কার — আলবৎ। দিগ্‌গজ পণ্ডিত নয়তো কী? আমি যা জানি তুই তা জানিস?

কুচিন্তা — তবে রে মুখপোড়া, তুই আমার চেয়ে কী বেশি জানিস বল তো?

সংস্কার — ফেলি বলে? দ্যাখ রাগ করবিনি?

কুচিন্তা — বল্ বলছি। তা না হলে আজ তোকে চরকী ঘোরান্ ঘুরিয়ে ছাড়ব।

সংস্কার — দেখ্, এখনও বলি নি, বলে ফেললে কিন্তু আর ফিরে পাবনি।

কুচিন্তা — বল্ বলছি মুখপোড়া— তা নইলে আজ— (কুচিন্তা সংস্কারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল)

সংস্কার — দাঁড়া, দাঁড়া, কাছে আসিস নে, একটু দূরে গিয়ে দাঁড়া। (কুচিন্তার তথাকরণ) হ্যাঁ, এইবার শুনবার জন্য প্রস্তুত হ। কেমন, হয়েছিস?

কুচিন্তা — বল নারে মুখপোড়া। শুনবার জন্য আমার প্রাণের ভেতর আঁকড়-পাঁকড় করছে।

সংস্কার — এই যেখানেই সংস্কার, সেখানেই কুচিন্তা। আর যেখানেই কুচিন্তা সেখানেই সংস্কার।

কুচিন্তা — তরে রে মুখপোড়া। আজ তোর শ্রাদ্ধ করে ছাড়ব। (কুচিন্তা সংস্কারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল)

সংস্কার — দ্যাখ কুচিন্তা—তুই নিশ্চয়ই দর্শন পড়েছিস। তা নইলে এত বড় কথা কিছুতেই বলতে পারতিস না। বেঁচে থাকতে শ্রাদ্ধ করলে—যার শ্রাদ্ধ করা হয় সেও একপেট খেয়ে বাঁচে— এতবড় নিগূঢ়, গাঢ় অথচ প্রগাঢ় সত্য এ পর্যন্ত কেউ বলতে পারে নি।

কুচিন্তা — মনিবের খেয়ে অনেক চর্বি হয়েছে— এবার চর্বি শুকোবে রে মুখপোড়া, চর্বি শুকোবে। মনিবের কাছ থেকে অন্ন উঠবার উপক্রম হয়েছে।

সংস্কার — হাঃ হাঃ হাঃ। তুই আমায় হাসালি কুচিন্তা, তুই আমায় হাসালি! এ বাপঠাকুর্দাকেলে চাকরী— এ কি আর সহজে যাবে? ধনপতি শ্রেষ্ঠী যতদিন থাকবে, সংস্কার আর কুচিন্তার চাকরীও ততদিন থাকবে। নে, তুই ভাবিস নে। এখন একটা গান গা মাইরি। অনেকদিন তোর গান শুনিনি।

কুচিন্তা — তুইতো কীর্ত্তন গেয়েছিস, আমিও কীর্ত্তন গাইছি। কিন্তু কার কীর্ত্তন বেশী মিষ্টি তা বলতে হবে।

সংস্কার — তা হক্ কথা। বলতে হবে বৈকি।

কুচিন্তা গাহিল—

বঁধুয়া পরাণে তিয়াসা জাগে
নয়ন মেলিনু তোমারে পেখিনু
মরমে আঁকিনু ছবি।
হৃদয় দহিল মরম টুটিল
হেরিয়ে দুপুর রবি।।
কুসুম পরশে চাহিনু হরষে
মিলিল কণ্টক শুধু।
চাঁদনী চাহিতে আঁধার বেড়ল
কাঁদিয়া মরিনু শুধু।
(বঁধুয়া পরাণ কাঁদিছে রাগে)
চরণ ধরিব মরণ সাধিব
তখন বুঝিবে মনে।
মরণ না হলে পিরীতি না হয়
পিরীতির ধারা ভণে।।

(রত্না ও ধনপতির প্রবেশ)

রত্না — সংস্কার, কুচিন্তা, অনেক রাত হয়েছে। তোরা বিশ্রাম করগে যা।

(যে আজ্ঞে বলিয়া সংস্কার ও কুচিন্তার প্রস্থান)

রত্না — আর্যপুত্র, চলুন বিশ্রাম করবেন চলুন।

ধনপতি — বিশ্রাম? বিশ্রাম করলে কি মৃত্যু রেহাই দেবে রত্না?

রত্না — না, না। আপনি আর মৃত্যুর চিন্তা করবেন না।

ধনপতি — মৃত্যুর চিন্তা যদি না-ই করি, তাহলেই কি মৃত্যু ছেড়ে দেবে?

রত্না — আমি ওসব শুনতে চাই না, চলুন আপনি বিশ্রাম করবেন।

(রত্না গিয়া ধনপতির হাত ধরিল)

ধনপতি — বন্ধু মন, আর বান্ধবী সুমতি-কুমতি কোথায়?

রত্না — তারা পাশের ঘরে অবস্থান করছেন। আর নয়, আপনি চলে আসুন।

(রত্না ধনপতির হাত ধরিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল)

(মনের প্রবেশ)

মন গাহিল— সং সাজালি শ্যামা আমায়
ভবের হাটেতে।
রং বেরঙের হরেক রঙের
ভুলের খেলাতে।।
আমিই বেচি আমিই কিনি
কুলকিনারা নাইরে তায়।
আমিই ভাঙ্গি আমিই গড়ি
ভাবনা হলো শুধুই সার।।
ভবের বাঁধন দে না খুলে
লুটিয়ে পড়ি চরণতলে।
অন্তে শ্যামা কালী বলে
মিশিয়ে যাই ওই চরণেতে।

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি — তুমি ঘুম থেকে উঠে এসে এখানে গান গাইছ?

মন — ঘুম হলো না, বন্ধু ধনপতির জন্য প্রাণটা কেমন অস্থির হতে লাগল।

(শয়ন মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি — কী করি বন্ধু মন, অরণ্যে যাব? সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে মৃত্যুর প্রতিকার চিন্তা করতে পারব।

মন — অরণ্য! তা মন্দ জায়গা নয়, সেখানে নিরুদ্বেগে মৃত্যু চিন্তা করতে পারবেন, এ সত্য। চাই কি, মৃত্যুর প্রতিকার মিললেও মিলতে পারে।

ধনপতি — তুমি কি বলো বান্ধবী সুমতি?

সুমতি — বনে গেলে যদি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান, তাহলে এক্ষুনি যান।

(বেগে কুমতির প্রবেশ)

কুমতি — শুনবেন না শ্রেষ্ঠী মহাশয়। শুনবেন না। ও সুমতি ছুঁড়ির কোনও কথা শুনবেন না। এই সুখের সংসার ছেড়ে আপনি যেতে চাইছেন কিনা বনে। সে হলো বন— বাঘ ভাল্লুকে ভরা। সেখানে না পাবেন সময়ে দুটো খেতে, না পাবেন সময়ে একটু আরাম করতে, আর না পাবেন স্থির হয়ে দুদণ্ড চিন্তা করতে। সুমতি কালকের ছুঁড়ি, ওর পরামর্শ শুনতে আছে?

ধনপতি — তাইত বন্ধু মন, কী করি?

মন — ঠিক নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

সুমতি — আপনি বনেই যান।

ধনপতি — পুরী নিদ্রিত, সংসার ত্যাগ করবার এই উত্তম সময়। বিদায় সংসার, বিদায় রত্না, বিদায় বন্ধু মন।

(বেগে ধনপতির প্রস্থান)

মন — (সুমতি ও কুমতি প্রতি) চলে এসো। আমরাও বন্ধু ধনপতির সঙ্গে বনে যাই।

সুমতি — সে তো হবেই— বন্ধুর কল্যাণ চিন্তা করতেই হবে।

কুমতি — এক্ষুনি চল, এক্ষুনি চল, সুমতি যে জিতে যাবে। সে আমি কিছুতেই সহ্য করব না। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে— সুমতি হারে না কুমতি হারে।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(স্থান—অরণ্যের পথে)

বনদেবীগণের প্রবেশ। তাঁহারা গাহিলেন—

চাঁপার কলি নয়ন মেলি,
চায় যে আকাশে।
বিভোর হয়ে আছাড় খেয়ে
মলয় যে আসে।।
লুটিয়ে পড়ে চাঁপার বুকে,
সজল আঁখি চাঁপার মুখে।
ও লো চাঁপা রাখ লো ধরে
সে যে তোরে ভালবাসে।।

(বনদেবীগণের প্রস্থান)

(বেগে সংস্কার ও তাহার পিছনে কুচিন্তার প্রবেশ)

সংস্কার — (চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে) আহা! টুকটুক করছে গায়ের রং রে! আহা অশোক ফুলের গোছা রে— আহা রে! অশোক ফুলের গোছা!

কুচিন্তা — ও মুখপোড়া, এই বুঝি তোর মনিবের খোঁজ হচ্ছে?

সংস্কার — আহা! অশোকফুলের গোছা রে— চাঁপাফুলের গোছা!

কুচিন্তা — দেখ্! ফের যদি তুই অশোকফুল, চাঁপাফুল করবি, তাহলে আমি এই দণ্ডেই বন থেকে চলে যাব।

সংস্কার — এ্যাঁ— এ্যাঁ! মাইরি যাসনি। ছেলেমানুষ, বনের মাঝে পথ হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাব।

কুচিন্তা — তুই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবি, তাতে আমার কী?

সংস্কার — না, না, কুচিন্তা, আর আমি বলব না, মাইরি বলব না। আহা চাঁপাফুলের গোছা রে, অশোক ফুলের গোছা!

কুচিন্তা — আবার ফিরে —

সংস্কার — না, না, কুচিন্তা! আর ও নাম কিছুতেই মুখে আনব না। আহা চাঁপাফুল—

কুচিন্তা — তবে রে মুখপোড়া, আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন।

সংস্কার — আহা চটিসনে কুচিন্তে, চটিসনে। আমি এই কানমলা খাচ্ছি— আর কখনও চাঁপাফুল, অশোকফুল।

কুচিন্তা — এই রইলি তুই বনে একা— আমি চললুম।

(কুচিন্তা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সংস্কার গিয়া তাহাকে ধরিল)

সংস্কার — আর নয়, আর কখনও ভুলেও নয় কুচিন্তা, আমি এখুনি তোকে কীর্ত্তন গেয়ে শোনাচ্ছি।

(সংস্কার গাহিল)

ও কে নদীয়ার বুকে হরি বলে যায়।
ও যে আমার প্রাণের গৌর রায়।
(গৌর) যত হরি বলে আঁখিবারি ঝুরে
তত ভূমেতে লুটায়।
ও যে শচীর প্রাণের গৌর রায়।।
রাধার প্রেমে মাতোয়ারা
রাধা ব'লে বইছে ধারা।
(বুঝি) রাধা এবার গৌর হয়ে
এল নদীয়ায়।।
(আমার) প্রেমের বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণসনে
গৌর আমার এক হয়ে যায়।।

কুচিন্তা — চল, এবার মনিবের খোঁজে যাওয়া যাক।

সংস্কার — ওই তোর কেমন বদ্ রোগ— সব কাজেই ব্যস্ত। এ হলো বাপঠাকুরদাকেলে চাকরী— এ যাবে বললেই যাবে? ধনপতি শ্রেষ্ঠী যতদিন থাকবে— সংস্কার আর কুচিন্তার চাকরী ততদিন কারও সাধ্যি নেই যে ছাড়ায়।

(সংস্কারের হাত ধরিয়া একদিক দিয়া কুচিন্তার প্রস্থান এবং বিপরীত দিক দিয়া রাজা প্রলোভন এবং বৈদ্যরাজ মিথ্যার প্রবেশ)

প্রলোভন — তাই তো বৈদ্যরাজ, জামাইয়ের কোন অনুসন্ধান করতে পারলুম না!

মিথ্যা — উন্মাদ! উন্মাদ! একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে— আপনার জামাতা ধনপতি শ্রেষ্ঠী মহাশয়।

প্রলোভন — ধনপতির ভাণ্ডারে চল্লিশটা সুবর্ণপাহাড় আছে— আমার রাজভাণ্ডারে একটাও নেই।

মিথ্যা — তাইত অত সুবর্ণের উত্তাপ শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের সহ্য হলো না— উন্মাদ হয়ে গেল!

প্রলোভন — আচ্ছা, আমি যদি রাজসিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ধনপতিকে দেশের রাজা করি, তাহলে হয়ত ধনপতি দেশে ফিরতে পারে।

মিথ্যা — তাহলে হয়ত ফিরতে পারে। কিন্তু মহারাজ মনে রাখবেন শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের অগ্রে বায়ুরোগের চিকিৎসা আবশ্যক।

প্রলোভন — চলুন, চলুন মহারাজ।

(একদিক দিয়া প্রলোভন ও মিথ্যার প্রস্থান এবং বিপরীত দিক দিয়া মনের প্রবেশ)

মন গাহিল—

তারা যদি পাই গো তোর দেখা
ওমা তখন বুঝবি মনে
কেমন মায়ের কেমন ছেলে
কঠিন বিধির কঠিন লেখা।।
মায়ের হলো শ্মশানে বাস।
ছেলের বুকে জ্বলছে শ্মশান।
জ্বলছে বার মাস।।
ওমা সে শ্মশানে নাচবি যদি
আয় না গো মা আয় না ধেয়ে।
বাজবে নাকো চরণে তোর
এ শ্মশান যে প্রেমে আঁকা।।

(সুমতির প্রবেশ)

সুমতি — বলি হ্যাঁ গা, শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের সংবাদ কী?

মন — শ্রেষ্ঠী মহাশয় গাঢ় মনযোগ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়নে রত।

সুমতি — শাস্ত্র অধ্যয়নে কি ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর প্রতিকার মিলবে?

মন — হয়ত মিললেও মিলতে পারে, তা নইলে শাস্ত্র পাঠে এত উৎসাহ কেন?

(বেগে কুমতির প্রবেশ)

কুমতি — কুমতির বিজয়োৎসবে তোর নিমন্ত্রণ রইল সুমতি।

সুমতি — কিসের বিজয়োৎসব গো?

কুমতি — আছে বৈকি! তা নইলে আর শুধু শুধু নিমন্ত্রণ করি!

সুমতি — বল না শুনি!

কুমতি — হাঃ হাঃ হাঃ! মোটা বুদ্ধি কিনা— এখনও বুঝে উঠতে পারে নি।

সুমতি — আমার বুদ্ধিটা না হয় মোটা। তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধির বিচারটা একটু শুনি।

কুমতি — হাঃ হাঃ হাঃ! শ্রেষ্ঠী মহাশয় শাস্ত্রপাঠ করে মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজছেন। আরে তা যদি মিলত, তাহলে যাঁরা শাস্ত্র তৈরি করে গেছেন, তাঁরা আর মরতেন না। এবার বুঝতে পারছিস তো কিসের বিজয়োৎসব?

মন — এখন চল, ওসব আর ভাল লাগে না, কুটিরে ফিরে চল।

(সকলের প্রস্থান)

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(স্থান— নদীকূল, কাল— রাত্রি— জ্যোৎস্নাময়ী)

(বিদ্যা গাহিতেছিল)

আমার তরী ভাসিয়েছিনু
চৈতীরাতের চাঁদনীতে।
কাল বারি উথলে উঠি,
হিয়ার মাঝে পড়ল লুটি।
কল্ কল্ ছল্ ছল্
কত কথা সোহাগেতে।।
কামিনী সে এলোচুলে,
মন ভোলানো হাসি তুলে,
দাঁড়িয়ে থেকে নদীর কূলে
ডাক দিয়েছে ইসারাতে
ঝিঁঝির গানে এমনি রাতে,
কথা ছিল পিয়ার সাথে,
ভেসে যাব দু'জনাতে,
ভোরের আলোর সেই দেশেতে।

(ধীরে ধনপতির প্রবেশ। উপলখণ্ডে উপবিষ্টা বিদ্যাকে দেখিয়া ধনপতি সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেল)

ধনপতি — একি আচার্য কন্যা, তুমি এখানে?

বিদ্যা — আমি তো এখানে নিত্য আসি।

ধনপতি — কই, আমি তো একদিনও দেখি নে!

বিদ্যা — তুমি হলে বাবার ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ছাত্র— কেবল শাস্ত্র অধ্যয়নে রত। আমাকে দেখবার ফুরসৎ কোথায়?

ধনপতি — শাস্ত্রপাঠে নিজেকে নিযুক্ত করেছি। দেখছি, যদি শাস্ত্রপাঠে মৃত্যুর কোন প্রতিকার পাই।

বিদ্যা — আলেয়ার অনুসরণ করে কী লাভ হবে শ্রেষ্ঠী মহাশয়? মরণকে বরণ করে নিলেও সে আসবে, আর তাকে অবহেলা করে দূরে রাখলেও সে ছাড়বে না। মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলে যান।

ধনপতি — মৃত্যুর কথা ভুলেও যদি যাই, তাহলেও মৃত্যু রেহাই দেবে না!

বিদ্যা — বাবার মুখে শুনেছি— আপনি বেদব্যাসের মতন প্রতিভাশালী। আপনি কিন্তু যা প্রাণহীন তাকেই প্রাণে রাখছেন, আর জীবন্ত যা তাকেই বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছেন। একবার ঐ তরল জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে দেখুন দিকি— সে, তার বুকের কোমল পরশ দিয়ে কী গাঢ় স্নেহভরে ধরিত্রীকে জড়িয়ে ধরেছে। ওই মুখরিত প্রবাহিনী কলতানে আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্য সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে। ওই তরুতলে কুসুমস্তবক নিজের সুগন্ধে আত্মহারা হয়ে বিকশিত— তারা নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য ওই জ্যোৎস্নার দিকে আকুল নয়নে তাকিয়ে আছে।

ধনপতি — কিন্তু আচার্যকন্যা, ওই জীবন্ত চিত্রের পাশে মৃত্যু এসে উঁকি মারছে— সেটা কি দেখেছ?

বিদ্যা — নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর! আমি কি চিরকালই তোমার কাছে আচার্যকন্যা হয়ে থাকব? একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ— দেখতে পাবে প্রাণের কী গভীর উন্মাদনা— তোমাকে আপনার করে জড়িয়ে ধরবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। আমার এই নয়নকোণে আমার হৃদয়ের ভালবাসা উথলে উঠে— তোমার সর্বাঙ্গ স্নিগ্ধ করে দেবার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করছে।

ধনপতি — এ্যাঁ— এ্যাঁ! এ কী বলছ বিদ্যা!

বিদ্যা — তুমি বিদ্যাকে নিয়ে আজীবন বিদ্যাচর্চা করো। পিতা আমায় বলেছেন, তিনি আচার্যপদে তোমায় ব্রতী করে তপস্যা করতে বনে চলে যাবেন। তুমি আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হও।

(বেগে সংস্কার আর কুচিন্তার প্রবেশ)

সংস্কার — হুজুর, হুজুর! প্রস্তুত হয়ে পড়ুন।

কুচিন্তা — আবার সুখের সংসার পাতুন। আমরা প্রাণপণে আপনার সেবা করব।

ধনপতি — একি! একি! সংস্কার তুমি! কুচিন্তা তুমি!

সংস্কার — আজ্ঞে হুজুর, বাপ-ঠাকুরদাকেলে চাকর— তাই আপনার পেছনে ঠিক ছায়াটির মতন আছি।

কুচিন্তা — পাছে আপনার পরিচর্য্যার কোন ত্রুটি হয় তাইজন্য আমিও সংস্কারের সঙ্গে এসেছি।

বিদ্যা — আমি আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছি। বিবাহে সম্মতি দিন— এই আমার মিনতি।

সংস্কার — দোহাই প্রভু, দোহাই আপনার। দ্বিতীয় আর একটা সংসার ফেঁদে ফেলুন।

কুচিন্তা — বিদ্যা ঠাকরুণ একে বিদুষী তার ওপর আবার রূপসী। মনিবমশাই, মনিবমশাই! আর বিলম্ব আবশ্যক করে না। ঝাঁ করে সম্মতি দিয়ে ফেলুন।

বিদ্যা — নারীর প্রেম উপেক্ষার বস্তু নয়— এটা মনে রাখবেন।

ধনপতি — মৃত্যুও উপেক্ষনীয় নয়। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি অপেক্ষা কর। মৃত্যুকে যদি আর একবার পেতুম তাহলে এ কথাটির মীমাংসা করে নিতুম।

(ধীরে মৃত্যুর প্রবেশ)

মৃত্যু — কিসের মীমাংসা করতে চাও শ্রেষ্ঠী মহাশয়?

ধনপতি — এই যে, এই যে মৃত্যু, তুমি এসেছ! আমি, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— এই বিদ্যা— আমার আচার্যকন্যা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদূষী, যেন মূর্তিমতী শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণি। বিদ্যার গুণ, বিদ্যার রূপ, বিদ্যার ভালবাসা— আমাকে, আমাকে তোমার হাত থেকে রেহাই দিতে— রেহাই দিতে পারবে না?

মৃত্যু — বিদ্যা মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না। অনেকেই সারাজীবন বিদ্যাচর্চা করে দিন কাটিয়েছে— কিন্তু কেউ তারা মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি— তুমিও পাবে না।

(মৃত্যুর প্রস্থান)

ধনপতি — বিদ্যা! বিদ্যা! আমি তোমাকে চাই না— আমি চাই মৃত্যুর প্রতিকার। মৃত্যুই চিরকাল জগতকে শাসন করে এসেছে— আর আমি চাই মৃত্যুকে শাসন করতে।

(বেগে ধনপতির প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(স্থান— বনভূমি। একখণ্ড শিলায় বসিয়া আশা গাহিতেছিল)

অরুণের ওই রঙিন রাঙা
ডাক দিয়েছে প্রভাতে।
আঁধার মাঝে আর কেন রে,
আয় না ছুটে আঙিনাতে।।
খুলে দেরে প্রাণের দুয়ার,
রেঙে উঠুক রঙিন রঙে।
বাজুক প্রাণে মাতাল তালে,
আকুল করা সাহানাতে।। (আশার প্রস্থান)

(যোগীর বেশে ধনপতি এবং যোগীশ্বর আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দগিরি —যোগই একমাত্র মৃত্যুর গতিরোধ করতে পারে। দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুকে যোগের দ্বারা জয় করেছেন বলে তার নাম মৃতুঞ্জয়।

ধনপতি — কিন্তু প্রভু যোগশাস্ত্র প্রণেতা পাতঞ্জল, তিনি তো কই মৃত্যুকে জয় করতে পারেন নি?

আনন্দগিরি —আচার্য পাতঞ্জল ইচ্ছা করলে আজও বেঁচে থাকতে পারতেন, তবে সে ইচ্ছা তাঁর হয়নি। তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে দেহরক্ষা করেছিলেন।

ধনপতি — বলেন কি প্রভু! আচার্য পাতঞ্জল আজও বেঁচে থাকতে পারতেন?

আনন্দগিরি —নিশ্চয়ই! সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ আছে?

ধনপতি — আমার কিন্তু চিরকাল বেঁচে থাকার বেশ বলবতী ইচ্ছা আছে।

আনন্দগিরি —অতি উত্তম কথা। তুমি যোগসিদ্ধ হও। অনায়াসে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে।

ধনপতি — এমন কেউ বেঁচে আছে কি প্রভু?

আনন্দগিরি — যোগী ইচ্ছা করলে বেঁচে থাকতে পারেন— এইটুকু জেনে রেখ। উদাহরণ আবশ্যক করে না।

ধনপতি — যোগের দ্বারা তাহলে মৃত্যুকে ঠিক জয় করতে পারব?

আনন্দগিরি —এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ কোর না বৎস। শাস্ত্র তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ধনপতি — আপনার কথায় আশ্বস্ত হলাম। প্রভু, আমার সুখের সংসার ছিল, রাশি রাশি সুবর্ণ সঞ্চয় করেছিলাম। কিন্তু মৃত্যু এসে যেদিন চোখের সামনে দাঁড়াল— আমি চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত সুবর্ণরাশি নিয়ে আমায় রেহাই দিতে তাকে অনুনয় করে

বললাম, কিন্তু অবজ্ঞার অট্টহাসি হেসে বললে, মৃত্যু কাউকেই রেহাই দেয় না। সংসার ছেড়ে পালিয়ে এলাম প্রভু, মৃত্যুকে জয় করবার উপায় অন্বেষণের দরুণ। ভাবলাম বিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যাবে— আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করলাম। কিন্তু দেখলাম, বিদ্যা প্রণয়িনীর মতন মুগ্ধ করতে পারে, কিন্তু সে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পারে না। তাহলে, আচার্য পাণিনি কখনও মারা যেতেন না।

আনন্দগিরি —অধৈর্য্য হবার কোন কারণ নেই বৎস। যোগের দ্বারা তুমি অনায়াসে মৃত্যুকে জয় করতে পারবে।

ধনপতি — প্রভু, আপনি আমায় যোগশিক্ষা দিন।

আনন্দগিরি —তুমি আশ্রমে গিয়ে অবস্থান করগে, আমি তোমার যোগশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করব।

(একদিক দিয়া আনন্দগিরির প্রস্থান এবং বিপরীত দিক দিয়া আশার প্রবেশ)

আশা — শ্রেষ্ঠী মহাশয়, চিনতে পারছেন আমায়?

ধনপতি — অ্যাঁ, অ্যাঁ! তোমায় যেন কোথায় দেখেছি। একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার দেখেছি অথচ তোমার নামটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

আশা — আমায় ভুলে যাচ্ছেন?

ধনপতি — না, না ঠিক ভুলিনি। তবে কিনা—

আশা — যখনই অবসাদ এসে আপনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে তখুনি আমি এসে উপস্থিত হই— আমি আশা।

ধনপতি — হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ঠিক মনে পড়েছে। কিন্তু তুমি কোথায় থাক বলো তো?

আশা — আকাশে কালো মেঘ দেখেছেন? সেই কালো মেঘের চারিধারে সোনালী রেখা দেখেছেন? ওটা হলো পরীরাজ্য, সেখানেই আমি থাকি। আবার দরকার হলে মানুষের হৃদয়ে এসে উপস্থিত হই।

ধনপতি — বুঝলাম, কিন্তু আমি যোগের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করতে চাই। তুমি কী বলো?

আশা — আপনি যোগের দ্বারা নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করতে পারবেন।

ধনপতি — কিন্তু, কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে— বিদ্যা অভ্যাস করতে যাবার আগে তুমি এই কথাই বলেছিলে।

আশা — আমি পরীরাজ্যে বাস করি, তাই পরীরাজ্যের রূপকথা শোনাতে বড় ভালবাসি।

ধনপতি — তাহলে যোগীশ্বর আনন্দগিরির আশ্রমে আমি যোগাভ্যাস আরম্ভ করে দিই।

(রাজা প্রলোভন ও বৈদ্যরাজ মিথ্যার প্রবেশ)

প্রলোভন — বাবাজি, তার চেয়ে তুমি দেশে ফিরে চল। সেখানে আমার সিংহাসনে বসে রাজমুকুট মাথায় দিয়ে দেশ শাসন করবে চলো।

মিথ্যা — কিন্তু তার আগে শ্রেষ্ঠী মহাশয়, আপনার চিকিৎসা আবশ্যক— এটা মনে রাখবেন।

ধনপতি — দূর হও প্রলোভন! দূর হও মিথ্যা! আমি রাজসিংহাসন চাই না, আমি চিকিৎসা চাই না। আমি চাই মৃত্যুকে জয় করতে, মৃত্যুকে শাসন করতে— যেমন একদিন দেবরাজ ইন্দ্র দানব বৃত্রকে শাসন করেছিল।

(বেগে ধনপতির প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক — প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(স্থান— কুচিন্তার কুটীর। কুটীরের দাওয়ায় কুচিন্তা বসিয়াছিল। গান গাহিতে গাহিতে সংস্কারের প্রবেশ)

গান—

বধূ এবার তোমায় করিব ভক্ষণ
তোমায় বাইরে রেখে
যখন বধূ হইগো অধীর।
পেটের ভেতর রেখে দিয়ে
দেখব বধূ হই কেমন গো স্থির।।
বধূ তোমার নয়ন দুটি,
যখন ওগো এধার ওধার করে,
আমার পেটের ভেতর চমকে ওঠে।
পিলে যকৃত ঘোরে।।
তুমি চরণ ফেলে যাও যে গো চলে
বুকের ভেতর কলজে আমার
দমক দিয়ে দোলে।।
এবার বধূ তোমায় আমায় হবে গো মিলন
চোখে চোখে রাখব সদা
করব তোমায় ধীরেতে চর্বন

কুচিন্তা — খুব নাচন-কোঁদন হচ্ছে যে? বলি এত ফুর্তি কিসের? চাকরী গেছে বলে?

সংস্কার — আর তোর চাকরী বুঝি বজায় আছে?

কুচিন্তা — আমি তো আর এমন নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছি নে।

সংস্কার — সংস্কারের চাকরী অত সহজে যাবে না।

কুচিন্তা — তোর যদি চাকরী না যায় তাহলে কুচিন্তার চাকরী যাবে না। যেখানে সংস্কার সেখানেই কুচিন্তা। শ্রেষ্ঠী মহাশয় কিন্তু এদিকে প্রগাঢ় যোগে মগ্ন হয়েছেন।

সংস্কার — তা অমন ঢের লোকের হয়। তা বলে কি তারা সহজে সংস্কারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়? হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হয়। যেমনি ফাঁক পাওয়া অমনি মনিবের পায়ে গিয়ে ছুটে পড়া। মনিব হয়ত হাজার বার দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? একবার না একবার তাকে নুয়ে পড়তেই হবে। যেমন নুয়ে পড়া, অমনি তুই গিয়ে হাজির। ব্যস— একদম যাকে বলে কিস্তিমাত।

কুচিন্তা — থাক্, থাক, আর বাহাদুরি করে দরকার নেই। এ বড় শক্ত মনিব। এখানে অত সহজে হবে না।

সংস্কার — সহজে না হয় কঠিন করে হবে— কিন্তু হবে তো বটে। একবার কুমতি ঠাকরুণ রত্নাদেবীকে আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে এলে হয়। তখন বুঝে নিই— হয় কি না হয়।

কুচিন্তা — তাতে আর তোর কিসের বাহাদুরী? কুমতি ঠাকরুণ, সুমতি ঠাকরুণকে জব্দ করার জন্য রত্নাদেবীকে আনতে গিয়েছিল।

সংস্কার — কথায় বলে, মেয়েছেলের অল্প বুদ্ধি— তোর হয়েছে তাই। একটা কাজ কি একলার দ্বারায় হয়? দশজন মিলে করতে হয়।

(কুমতির হাত ধরিয়া রত্না, রাহুল, শর্মিষ্ঠার প্রবেশ)

রত্না — কই, কই আর্যপুত্র কোথায়?

রাহুল — বাবা কোথায়, বাবা কোথায়? হ্যাঁ মা, বাবা এই বনে আছে?

কুমতি — (রত্নার হাত ধরিয়া) দিদি, তোমাকে এখন এখানে অপেক্ষা করতে হবে, তবে শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের দেখা পাওয়া যাবে। আমি যাই, দেখিগে সব কে কোথায় আছে।

রত্না — দিদি, দিদি, একবার আর্যপুত্রকে দেখাও। আমি অনেকদিন তাঁকে দেখিনি।

কুমতি — শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের সংবাদের জন্যই তো যাচ্ছি।

রাহুল — মাসিমা, মাসিমা, তুমি এখুনি যাও, বাবাকে নিয়ে এস।

কুমতি — আচ্ছা, আমি চললুম। (কুমতির প্রস্থান)

সংস্কার — আসুন মা ঠাকরুণ, এই কুটীরে বিশ্রাম করবেন আসুন।

কুচিন্তা — কুচিন্তা বেঁচে থাকতে আপনাদের সেবার কোন ত্রুটি হবে না।

রত্না — সংস্কার, কুচিন্তা, তোরা আমায় আর্যপুত্রের কাছে নিয়ে চল্।

সংস্কার — কুমতি ঠাকরুণ প্রভুর সংবাদ নিয়ে ফিরলেই আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।

কুচিন্তা — আসুন মা ঠাকরুণ, ঘরের ভেতরে আসুন— একটু থিতুবেন, জিরোবেন চলুন।

(সকলের কুটীরের মধ্যে প্রবেশ।)

তৃতীয় অঙ্ক — দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

—তৃতীয় দৃশ্য—

(স্থান— বনভূমি, সুমতি তালপত্রে লিখিত গীতা হস্তে দণ্ডায়মানা। মৃগচর্মে বসিয়া মন গাহিতেছিল। উভয়ের গৈরিক বাস।)

মনের গান— মুণ্ডুমালা কে দিল মা
গলায় ওগো তোর।
ব্রহ্মাণ্ড যে মা-মা বলে
শরণ চায় মা চরণ তলে।
মা হয়ে মা কেমন করে
ছেলের মুণ্ড গলায় পর?
তোর রীতি মা তুই বুঝিস গো
বজ্র পড়ুক বিচারেতে।
আমার মুণ্ড নিয়ে মাগো,
রাখিস রাঙ্গা চরণেতে তোর।।

(সুমতি গীতাখানি মনের হাতে দিল)

মন — (গীতা খুলিয়া) শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এই মনোরম প্রভাত প্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। এ কী আশ্চর্য সুমতি। গীতা হাতে করবা মাত্রই গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক আপনা হতে খুলে গেল। শোন— শোন সুমতি, শ্রীভগবান কী বলেছেন।

সর্বধর্মাণ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

(উন্মুক্ত অসি হস্তে রাজা প্রলোভন এবং তৎপশ্চাৎ বৈদ্যরাজ মিথ্যার প্রবেশ)

প্রলোভন — তবে রে ব্যাটা ভণ্ড, বনে এসে লুকিয়েছ? ভেবেছ রাজা প্রলোভন

তোমার সন্ধান পাবে না? বল্ বলছি আমার জামাইয়ের সংবাদ, তা নইলে আজ তোকে হত্যা করে সমস্ত রাগ মেটাব।

(মন শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল)

মন — কী অপরাধ আমার রাজা প্রলোভন?

প্রলোভন — বটে, অপরাধ কী? তুই ব্যাটাই তো আমার জামাইকে শলাপরামর্শ দিয়ে দেশত্যাগী করেছিস্। আবার এখন নিরীহ ভালমানুষের মতন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে— কী অপরাধ আমার?

মন — আমার পরামর্শে আপনার জামাই দেশত্যাগী হয়েছেন— এ কী কথা বলছেন রাজা প্রলোভন!

প্রলোভন — একবার ছেড়ে একশবার বলব। উঃ, ব্যাটা আমার যোগী সেজেছেন! আচ্ছা বল্ দেখি, আমার জামাই না হয় যোগাভ্যাস করতে গেছে— তুই যোগী সেজেছিস কেন?

মন — বন্ধু যোগী হয়েছে, তাই আমাকেও যোগী সাজতে হয়েছে।

প্রলোভন — কেন, তুই কি বন্ধুর ধাইমা! বন্ধুর যেমনি যোগী সাজা —উনিও অমনি পটাং করে যোগী সেজে বসলেন!

মন — পৃথিবীতে আমার নিজের বলতে কিছু নেই— যা কিছু সমস্তই বন্ধুর। তাই বন্ধু যখন যে বেশে সাজে আমাকেও সেই বেশে সাজতে হয়।

প্রলোভন — ওসব ছেঁদো কথায় ভুলব না। এখন নিয়ে চল্ আমাকে, তোর বন্ধু যেখানে যোগাভ্যাস করছে সেখানে।

মিথ্যা — ও হে ছোকরা তোমার বন্ধুর চিকিৎসার আবশ্যক।

সুমতি — আর্যপুত্র, বন্ধুর সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে রাজা প্রলোভনকে কখনও সেখানে নিয়ে যেও না।

প্রলোভন — না নিয়ে গেলে আমি এখুনি তোমার স্বামীকে হত্যা করব।

সুমতি — আপনি রাজা! আমরা অপরাধ করে থাকি তো শাস্তি দিন। সে শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। তা বলে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।

মিথ্যা — আরে বেটি, তা নয়, তা নয়, একে বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই বলে না। একটা লোক উচ্ছন্নয় যেতে বসেছে— আমাদের পাঁচজনের চেষ্টা করা উচিত তো, যাতে লোকটা ভাল হয়। এবার বুঝলে তো, এখন চলো। ধনপতি লুকিয়ে বসে কোথায় ধ্যান করছে, সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেবে চল।

সুমতি — আমাদের দ্বারা হবে না।

মিথ্যা — আহা, হ্যাঁ, গীতায় শ্রীভগবান কী বলেছেন জানো—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

কাজ করে যাও, ফলের আকাঙ্খা কোর না, তোমরা শ্রেষ্ঠী মহাশয় কোথায় আছে দেখিয়ে দেবে। তাতে ভাল হবে কি মন্দ হবে— তাতে করমচা ফলবে কি আঙ্গুর ফলবে, সে দেখবার দরকার নেই। আহা, গীতার মর্ম কটা লোকেই বা বোঝে!

মন — ঠিক ঠিক, গীতায় বলেছে বটে, মা ফলেষু কদাচন। সুমতি চলো আমরা শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের কাছে এঁদের নিয়ে যাই।

সুমতি — আপনার যা ইচ্ছা প্রভু, আমার কাছে তা আজ্ঞা!

(কুমতির প্রবেশ)

কুমতি — (সুমতির প্রতি) কী লো, স্বামীকে নিয়ে কেমন ঘর করছিস?

মন — দূর হয়ে যা কালামুখী।

কুমতি — এ সাতপাক দিয়ে বাঁধা স্বামী মশাই! এ দূর করলেই কি আর দূর হয়!

প্রলোভন — চল্ চল্, আর এখানে দেরী করে দরকার নেই।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক — তৃতীয় দৃশ্য সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

— চতুর্থ দৃশ্য—

(স্থান— আনন্দগিরির আশ্রম। দুইটি শিলাখণ্ডের উপর বিস্তৃত মৃগচর্মে আনন্দগিরি ও ধনপতি উপবেশন করিয়াছিল।)

আনন্দগিরি — যোগীর যা কিছু শিক্ষার বিষয় সে সমস্তই তোমার আয়ত্ত হয়েছে। এখন শুধু অভ্যাসের আবশ্যক।

ধনপতি — প্রভু, আপনার শিক্ষায় আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে আমায় সমস্ত শিক্ষা অর্পণ করেছেন।

আনন্দগিরি — তোমার প্রতিভায় আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে উঠতাম, তাই সারাজীবনে যোগাভ্যাসের দ্বারা যা অর্জন করেছিলাম— সেই অর্জিত ফল তোমায় দান করতে কখনও কুণ্ঠা এসে উপস্থিত হয়নি।

ধনপতি — কিন্তু প্রভু, আমার হৃদয় সন্দিগ্ধ।

আনন্দগিরি — কিসের সন্দেহ বৎস?

ধনপতি — যোগাভ্যাসের দ্বারা কি মৃত্যুকে জয় করতে পারব?

আনন্দগিরি — যোগের দ্বারা শত বৎসর পরমায়ুর স্থানে সহস্র বৎসর পরমায়ু অর্জন করা যায়।

ধনপতি — কিন্তু তারপর তো মৃত্যু আসবে—তার গতি রোধ করতে পারা যাবে না?

আনন্দগিরি — না, তখন মৃত্যুর গতিরোধ করবার ইচ্ছা হবে না। মৃত্যুকে তখন মুক্তিদাতা বন্ধু বলে মনে হবে।

ধনপতি — আমি কিন্তু মৃত্যুকে জয় করতে চাই।

(ধীরে মৃত্যুর প্রবেশ)

মৃত্যু — মৃত্যুকে জয় করা যায় না শ্রেষ্ঠী মহাশয়। মৃত্যু অজেয়।

ধনপতি — এ্যাঁ! এ্যাঁ! মৃত্যু তুমি! কেন তুমি এখানে এলে?

মৃত্যু — সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ এই পর্যন্ত মৃত্যুর গতিবিধির সীমা নির্দেশ কখনও হয়নি, আর হবেও না। সর্বত্রই তার অবাধ গতি। এখানে আবশ্যক আছে তাই এসেছি।

ধনপতি — মৃত্যু, মৃত্যু, তুমি কি আমায় নিতে এসেছ? কিন্তু, কিন্তু আমি যে এখনও চেষ্টা করে দেখব মৃত্যুকে জয় করতে পারা যায় কিনা!

মৃত্যু — না, না শ্রেষ্ঠী মহাশয়, আপনাকে এখন আমি চাই না। আপনার গুরুদেবকে মৃত্যুরাজ্যে নিয়ে যেতে এসেছি।

ধনপতি — সে কি! গুরুদেব যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ!

মৃত্যু — যোগসিদ্ধই হোক, তপসিদ্ধই হোক, মৃত্যুর আধিপত্য সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

ধনপতি — গুরুদেব, গুরুদেব, এ কী সত্য?

আনন্দগিরি — বৎস, মৃত্যু কখনও মিথ্যা বলে না।

ধনপতি — তবে, তবে যোগাভ্যাসে তো মৃত্যু জয় হবে না! আমি চাই মৃত্যুকে জয় করতে। আমি বিদ্যা চাই না, আমি যোগ চাই না— আমি চাই মৃত্যু এসে আমার চরণে মাথা নোওয়াবে।

(বেগে ধনপতির প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(স্থান— অরণ্যের পথ। গান গাহিয়া বনবালাগণের প্রবেশ ও গীত।)

গান — নীলগগনের গায়
ওগো নীল গগনের গায়
হিঙুল রঙের ঢেউ খেলে যে যায়।
ঢেউ খেলে যে যায়।।
বইছে মৃদুল বায়,
ওগো বইছে মৃদুল বায়।।
কাঁপিয়ে পরাণ উঠল জেগে।
ছুটে যেতে চায়।।
আকুল হলো নীলের সায়র
কুল কিনারা নাইকো রে তার
ডোবে যদি ডুবুক তরী
নাইকো ক্ষতি তায়।।

(বনবালাগণের প্রস্থান।)

(বেগে সংস্কারের প্রবেশ।)

সংস্কার — চলে গেল রে, চলে গেল, আহা চলে গেল!

(বেগে কুচিন্তার প্রবেশ)

কুচিন্তা — তবে রে মুখপোড়া! কে চলে গেল?

সংস্কার — আহা, আমায় নিয়ে গেল না রে, চলে গেল!

কুচিন্তা — যা যা মুখপোড়া! চলে যা দেখি, কতদূর তোর আস্পর্ধা।

সংস্কার — হ্যাঁ, কুচিন্তা, তুই!

কুচিন্তা — হ্যাঁ আমি, বলি চলে গেল কে?

সংস্কার — কই, কেউ তো যায়নি?

কুচিন্তা — তবে এতক্ষণ ধরে চলে গেল, চলে গেল করা হচ্ছিল যে?

সংস্কার — ও! ও আমি একটি স্বপ্ন দেখছিনু।

কুচিন্তা — দাঁড়িয়ে, জেগে স্বপ্ন দেখা!

সংস্কার — আহা জেগে অনেকেই স্বপ্ন দেখে, তুই দুনিয়ার খবর নিয়ে দেখ না, দেখবি সকলেই জেগে স্বপ্ন দেখছে।

কুচিন্তা — কিন্তু আমি বলছি তুমি কখনও জেগে স্বপ্ন দেখতে পাবে না।

সংস্কার না, না আমি কখনও আর জেগে স্বপ্ন দেখব না।

কুচিন্তা — যদি দেখ?

সংস্কার — তাহলে, তাহলে এই হাড়গিল্লের কালিয়া আর নিমপাতার চাটনী খাব।

কুচিন্তা — ওঃ! মস্ত বড় দিব্বি গালা হলো তো? তুই হাড়গিল্লের কোর্মা আর নিমপাতার চাটনী খেতে পারিস? তবে চালাকি হচ্ছে? এদিককার খবর কী বল্।

সংস্কার — মনিবপত্নী, মনিবের ছেলে মেয়ে, রাজা, রাজবৈদ্য সকলেই দেশে পৌঁছেচেন।

কুচিন্তা — আহা! ঠাকরুণের যে কী কান্না!

সংস্কার — মনিবের বন্ধু মন পাগল হয়ে গিয়ে সব মাটি করল!

কুচিন্তা — আহা! সে বেচারার কী অপরাধ! পাগল হয়ে গেল, সে আর কী করে মনিবের সন্ধান দেবে?

সংস্কার — তাই তো সকলে হতাশ হয়ে দেশে ফিরে গেল।

কুচিন্তা — ঐ, ঐ না, মনিবের বন্ধু মন মশাই আসছেন? চল, চল, আমরা একটু আড়ালে যাই দেখি কী করে।

সংস্কার — চল।

(কুচিন্তা ও সংস্কারের অন্তরালে গমন)

(মনের প্রবেশ)

মন গাহিল—

বল দেখি মা শুধাই তোরে
কী হবে মা শেষের দিনে।
সারা জীবন গেল ভেবে
পেলুম না কিছুই ভবে।।
ফুরিয়ে এলো দিনের খেলা
আঁধার ঘনিয়ে আসে মনে।
ভেবেছিনু মায়ের ছেলে
মা নেবে মার কোলে তুলে।।
কই মাগো তুই এলি না কো
পেলুম না মা এ জীবনে।
আসুক আঁধার ডরাই নাকো
অন্তরে মা তুমি থেকো।।
মরণে মা স্থান দিও গো
অভয় তোমার চরণে।।

(গানের মধ্যভাগে সুমতি প্রবেশ করিয়াছিল।)

মন — (সুমতিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে) তুমি, তুমি সুমতি, কেমন না? ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। শোন, ধনপতি শ্রেষ্ঠী জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ছিল। রাশি রাশি সুবর্ণ সঞ্চয় করেছিল। ধনাগারে এক এক করে চল্লিশটা সোনার পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সংসারে তার অভাব কিছু ছিল না। পতিপরায়ণা স্ত্রী, প্রিয়দর্শন পুত্র, আনন্দদায়িনী কন্যা, উজ্জ্বল আনন্দময় স্বাস্থ্য, মসীবিন্দুশূন্য শুভ্র পটতুল্য চরিত্র— সব ছিল, সব ছিল।

সুমতি — আর্যপুত্র, সমস্তই তো আমি জানি।

মন — না, না, তবু শোন। শরতের প্রভাতে গাঢ় নীল আকাশ কখনও কি দেখেছ? দেখেছ! বেশ, বেশ। কী গাঢ় তার নীলিমা। চক্ষু জুড়িয়ে যায়। সেই নীল আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল কালো মেঘে। যে মেঘ দেখলে হৃদয়ে আনন্দ হয় না। সে যেন একটা তীব্র বিষাক্ত— জ্বালা ঢেলে দেবার জন্য আকাশে উঠেছে!— ঠিক সেইরকম মেঘ; সেই মেঘ থেকে তিনজন দৈত্য নেমে এল। যেমন কদর্য্য তাদের আকৃতি, তেমনি কর্কশ তাদের মুখের বাণী।

সুমতি — আর্যপুত্র! আর্যপুত্র! আপনি ও সমস্ত কথা ভুলে যান।

মন — ভুলব! ভুলব! না, না! ও সমস্ত কি ভোলা যায়! জীবনস্মৃতির শেষ ঝঙ্কারের সঙ্গে ও সমস্ত বাঁধা হয়ে গেছে। ও যদি ভুলে যাই, তবে আমি বেঁচে থাকবো কী করে? হ্যাঁ, হ্যাঁ শোন, শোন— তিনজন দৈত্য, কুৎসিত তাদের অবয়ব আর নির্মম তাদের বাক্য। তারা কী পরিচয় দিল জানো? একজন বললে— আমি ব্যাধি, আর একজন বললে— আমি জরা, আর একজন বললে, আমি মৃত্যু।

সুমতি — ওসব তো আমি অনেকবার শুনেছি আর্যপুত্র।

মন — ফিরে শোন, ফিরে শোন! ব্যাধি বলে, আমি তোমার দেহমন্দির অধিকার করে তোমার জীবনের আনন্দ হরণ করব। জরা বললে, আমি তোমার সর্বাঙ্গে শ্লথ লিপ্ত করে দিয়ে তোমায় পঙ্গু করব। মৃত্যু বললে, ঐ যবনিকার অন্তরালে আমার যে মসীময় রাজ্য আছে, আমি তোমায় সেখান উধাও করে নিয়ে যাব। বেচারী ধনপতি স্তম্ভিত। সে কত অনুনয় করে মৃত্যুকে বললে, মৃত্যুমশাই, আমার সঞ্চিত সুবর্ণরাশি গ্রহণ করে আমায় রেহাই দিন। নিষ্ঠুর মৃত্যু জবাব দিল, না মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই। ধনপতির প্রাণ হা-হা করে কেঁদে উঠল। সে

সংসারের সকলকে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো, তোমরা কি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পার? নিরুপায় সংসার ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, মৃত্যুর হাত থেকে কারোর নিস্তার নেই।

সুমতি — সকলেই মরে। শ্রেষ্ঠী মশাইও মারা যাবেন, এতে আর ব্যাকুল হবার কী আছে?

মন — তা, তা ব্যাকুল হবার কারণ আছে বৈকি সুমতি। মৃত্যু আসবে আর বলবে চলো, অমনি সুড় সুড় করে চলে যেতে হবে? যদি মৃত্যুর বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর গতিরোধ করবার চেষ্টা না করা হলো, তাহলে মনুষ্যজন্ম বৃথা।

সুমতি — কিন্তু আর্যপুত্র, এ পর্যন্ত মৃত্যুকে জয় করতে কেউ তো পারে নি?

মন — তাই শ্রেষ্ঠী ধনপতি, মৃত্যুকে জয় করতে সংসার ত্যাগ করে জয়যাত্রা করেছিল। সংসার ধনপতিকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পারে নি। ধনপতি ভাবলো হয়ত বিদ্যা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দেবে। সে বিদ্যার আরাধনায় নিযুক্ত হলো। প্রিয়তমার হাসি হেসে বিদ্যা ধনপতিকে বরমাল্য পরিয়ে দিতে এলো। শ্রেষ্ঠী বললো— না, না, আমি তোমার বরমাল্য চাই না; আমায় মৃত্যর হাত থেকে রেহাই দিতে পারো? বিদ্যা বলল, আমি তোমার শিরায় শিরায় প্রতি রক্তকণিকায় এমন আনন্দের প্রবাহ ঢেলে দেব যার স্নিগ্ধ মাধুর্য আর অচঞ্চল সৌন্দর্য তোমায় মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দেবে। ধনপতি বলল— না, না, আমি তোমায় চাই না, তোমার মাধুর্য চাই না, তোমার সৌন্দর্যও চাই না— আমি চাই মরণকে জয় করতে।

সুমতি — তারপর শ্রেষ্ঠী মশাই কী করলেন?

মন — শ্রেষ্ঠী মশাই যোগীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রুদ্র রুক্ষ বৈশাখতুল্য যোগীর চরণে আছাড় খেয়ে পড়ে তারস্বরে আর্তনাদ করে বললেন, ওগো আমায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করো। শ্রাবণের ঘনঘটা সদৃশ জটাজুট প্রকম্পিত করে যোগী বলল, 'আমি তোমায় সহস্র বৎসর পরমায়ু দান করতে পারি— তা বলে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিতে পারি না।'

সুমতি — তাহলে এখন উপায়?

মন — নিরুপায় শ্রেষ্ঠী মহাশয় সমস্ত জগত থেকে মন কুড়িয়ে নিয়ে নিজের অন্তরে স্থাপন করে বোধিদ্রুম তলে ধ্যানমগ্ন হয়ে মৃত্যু জয়ের পরিকল্পনা করছেন।

সুমতি — আর্যপুত্র বিশ্রাম গ্রহণ করবার সময় হয়েছে, বিশ্রাম গ্রহণ করবেন চলুন।

মন — বিশ্রাম! বিশ্রাম নেই সুমতি। সংসারকে যতদিন না মৃত্যুভয় থেকে নিষ্কৃতি দান করতে পারি ততদিন বিশ্রাম নেই। চল, চল, বোধিদ্রুম তলে যাই। দেখি বন্ধু মৃত্যুজয়ের কী বিপুল আয়োজন করছেন।

(সুমতির হাত ধরিয়া টলিতে টলিতে মনের প্রস্থান।)

(বিপরীত দিক দিয়া সংস্কার ও কুচিন্তার প্রবেশ)

কুচিন্তা — শুনলি তো মনিবের দুর্দশার কথা! আমার আর বেঁচে থাকবার আদপে ইচ্ছা নেই। আমি এবার বিষ খেয়ে মরব।

সংস্কার — দোহাই কুচিন্তা, দোহাই তোকে, অমন কাজটি করিসনে। ওর চেয়ে আমি তোকে ঝাঁ করে একটা গান শুনিয়ে দিচ্ছি। তোর প্রাণ এক্ষুণি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সংস্কার গান গাহিল —

ওরে আমার সাধের চন্দনা,
(তোমায়) যতই পরাই সোনার গহণা,
তুমি তো কই পোষ মান না।।
আদর সোহাগ পেট ভরে দিই
মন তো তোমার পেলাম না কই
দাঁড়ের কাছে গেলে পরে
ঠুকরে দিতে ভুল হয় না।
এবার যাব বৃন্দাবনে
মিশিয়ে যাব মালপো সনে
(তখন) এধার ওধার খুঁজলে পরে
আর তো আমায় পাবে না।।

কুচিন্তা — না, না, আমি তোর গান শুনতে চাই না! তোর গান শুনতে চাই না। আমি বিষ খেয়ে মরব। (কুচিন্তার দ্রুত প্রস্থান)

সংস্কার — অমন কাজ করিসনে, অমন কাজ করিসনে! (সংস্কারেরও দ্রুত প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক — প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(স্থান— অরণ্য। বোধিদ্রুম তলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ধনপতি শ্রেষ্ঠী বসিয়াছিল। পাত্রে পায়সান্ন লইয়া ধীর পদক্ষেপে বোধিসত্ত্বের প্রবেশ)

বোধিসত্ত্ব — বৎস ধনপতি, তোমার বোধিসত্ত্ব লাভ হোক।

ধনপতি — এ্যাঁ, এ্যাঁ— এ্যাঁ, আমি বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব — দাও, দাও এবার তোমার সম্যক পরিচয় দাও।

ধনপতি — আমি বোধিসত্ত্ব, আমি বুদ্ধি নই, আমি মন নই, আমি ইন্দ্রিয় নিচয় নই— আমি দেহ নই, আমিই বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব — দাও! আরও সম্যকভাবে তোমার পরিচয় দাও।

ধনপতি — আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি অজর, অমর, আমি অমৃতের সন্তান। আমিই অমৃত, আমিই বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব — বৎস উঠে এসো। এই পায়সান্ন গ্রহণ করে দেহরক্ষা কর। একদিন আমিও বোধিসত্ত্ব লাভ করে সুজাতার হস্তে পায়সান্ন গ্রহণ করে দেহরক্ষা করেছিলাম। (ধনপতি আসিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।)

ধনপতি — প্রভু, আপনি কে?

বোধিসত্ত্ব — আমায় কেউ শাক্যমুনি বলে, কেউ সিদ্ধার্থ বলে, কেউ বলে অমিতাভ, আবার কেউ তথাগত বলে।

ধনপতি — প্রভু, আপনি বোধিসত্ত্ব, আপনাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হই।

(ধনপতি প্রণাম করিল)

বোধিসত্ত্ব — আমিও বোধিসত্ত্ব— তুমিও বোধিসত্ত্ব।

ধনপতি — কিন্তু প্রভু, ব্যাধি-জরা-মৃত্যু, তারা— তারা তো আসবে!

বোধিসত্ত্ব — আসবে কি বলছ? ঐ দেখ তারা এসেছে। এসো, এসো ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, তোমরা এগিয়ে এসো।

(ব্যাধি, জরা, মৃত্যু অগ্রসর হইয়া আসিয়া বোধিসত্ত্ব ও ধনপতিকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।)

বোধিসত্ত্ব — ব্যাধি, তুমি কি বোধিসত্ত্বের প্রতি নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাও?

ব্যাধি — প্রভু, আমি বোধিসত্ত্বের দাসানুদাস। বোধিসত্ত্বের আজ্ঞায় আমি ঐ পঞ্চভূতসৃষ্ট দেহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে পরাক্রম দেখাই।

বোধিসত্ত্ব — জরা, অদেহী বোধিসত্ত্বের ওপর তোমার কি কোন দাবী আছে?

জরা — অদেহী বোধিসত্ত্ব আমার প্রভু! আমি তাঁর দাসানুদাস মাত্র। চর্ম, মেদ, শোনিত, অস্থি, মাংস, মজ্জা— এদের ওপর আমার আধিপত্য— তাও প্রভু বোধিসত্ত্বের আজ্ঞায়।

বোধিসত্ত্ব — মৃত্যু, অমৃত বোধিসত্ত্বের ওপর তোমার কী অধিকার?

মৃত্যু — অমৃত বোধিসত্ত্বের আমি দাস মাত্র। বোধিসত্ত্ব অমৃত। তিনি আমার প্রভু। মরণশীল যা, তাদের ওপর আমার আধিপত্য— তাও বোধিসত্ত্বের আদেশে।

বোধিসত্ত্ব — শ্রেষ্ঠী, এবার বল তুমি কে?

ধনপতি — আমি বোধিসত্ত্ব, আমি বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব — ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, তোমরা কে?

ব্যাধি, জরা, মৃত্যু — আমরা বোধিসত্ত্বের দাস।

ধনপতি — প্রভু, তাহলে আমি মৃত্যুকে জয় করেছি?

বোধিসত্ত্ব — বোধিসত্ত্ব লাভের দ্বারায় তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ। মৃত্যুর অধিকার মাত্র দেহে। বোধিসত্ত্ব অমৃত—বোধিসত্ত্ব অমর।

মৃত্যু — প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করি।

বোধিসত্ত্ব — যাও তোমরা, নিজেদের নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হও গে।

(প্রণাম করিয়া ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর একদিক দিয়া প্রস্থান এবং বিপরীত দিক দিয়া টলিতে টলিতে সংস্কারের প্রবেশ)।

সংস্কার — প্রভু বিদায়! আপনার কাছ থেকে শেষ বিদায় প্রার্থনা করতে এসেছি। কুচিন্তা বিষ খেয়ে মরেছে, আমিও বিষ খেয়েছি।

ধনপতি — সংস্কার, সংস্কার কী বলছ তুমি! তুমি বিষ খেয়েছ?

সংস্কার — হ্যাঁ প্রভু, বিষ খেয়েছি। আজন্ম আপনার সেবা করেছি। তাই একবার শেষকালে দেখতে এলাম। এখন চির বিদায়।

(টলিতে টলিতে সংস্কারের প্রস্থান)

ধনপতি — প্রভু, সংস্কার বিষ খেয়েছে!

বোধিসত্ত্ব — বোধিসত্ত্ব এলে সংস্কার ধ্বংস হয়ে যায়। তাই সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। অধীর হবার কোন কারণ নেই।

ধনপতি — কুচিন্তা, সংস্কার— অনেক সেবা করেছে।

বোধিসত্ত্ব — তাদের সেবার আর তোমার আবশ্যক নেই। নতুন চৈতন্য সংস্পর্শে তোমার নবজীবন লাভ হয়েছে— এ জীবনে কুচিন্তা আর সংস্কার তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না।

ধনপতি — প্রভু আদেশ করুন, এখন আমার কী কর্তব্য?

বোধিসত্ত্ব — তোমার বোধিসত্ত্ব লাভ হয়েছে— তোমার এখন শুদ্ধমন— শুদ্ধমনে যা উদয় হবে তাই তোমার কর্তব্য।

ধনপতি — প্রভু! প্রভু! বোধিসত্ত্ব বলছেন সমস্ত জগদ্বাসীর কাছে অমৃতের সংবাদ প্রচার করতে। জগতের সমস্ত নরনারী জানুক যে তারা দেহী নয়, তারা বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব — শ্রেষ্ঠী, শ্রেষ্ঠী, বোধিসত্ত্ব লাভের পর আমারও প্রাণ পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর জন্য হাহাকার করে কেঁদে উঠেছিল। নাও বৎস, এই পায়সান্ন গ্রহণ করে দেহরক্ষা কর। তারপর মনুষ্যজাতির কাছে তারস্বরে প্রচার করে বেড়াও— মানুষ, তুমি অমৃতের সন্তান, তুমিই অমৃত।

ধনপতি — (বোধিসত্ত্বের নিকট হইতে পায়সান্নের পাত্র গ্রহণ করিয়া) তৃপ্তো'স্মি! তৃপ্তো'স্মি!

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

(স্থান— নগরের প্রান্তভাগ। বৌদ্ধশ্রমণের বেশে মন, কিন্তু সুমতির সাধারণ বেশ। সুমতি একটি কূপের পার্শ্বে একগাছি রশি, একটি জলের পাত্র লইয়া বসিয়াছিল। মন একটি কুটীরের সামনে একখানি অজিন বিস্তৃত করিয়া বসিয়াছিল। তাহার সামনে কতকগুলি ঔষধের পাত্র)

মন গাহিতেছিল—

ভবে তুই করলি কিরে
ভাবলি নারে কী হবে তোর এর পরে।
ভাবিস মনে বড়ই চালাক
চলতে গিয়ে খাস নেরে পাক।
আঁকু-পাঁকু করে বেড়াস
তবু আঁখি ফুটলো না রে।।
টুটলো না তোর মনে ধাঁধা
ঘুচলো না তোর মোহের গ্যাদা।
নিত্য ভেবে অনিত্যেরে
রইলি যে তুই আঁকড়ে ধরে।।
চোখে বাঁধন দিয়ে কষে
দিনের আলো দেখলি না রে।।

সুমতি — (মনের দিকে অগ্রসর হইয়া) বলি ওগো! ও শ্রমণঠাকুর— তোমায় আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কিনা?

মন — কী, তুই নারী হয়ে শ্রমণের সঙ্গে কথা কইতে সাহস করছিস? জানিস নারীর সঙ্গে শ্রমণের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ।

সুমতি — নারীর সঙ্গে শ্রমণের কথা কওয়া নিষেধ, কিন্তু তুমি যে এখন আমার সঙ্গে কথা কয়ে ফেললে— তার উপায় কী?

মন — এ্যাঁ, এ্যাঁ, এটা কি তোর সঙ্গে কথা কওয়া হলো নাকি?

সুমতি — তা হলো বৈকি!

মন — তাহলে উপায়!

সুমতি — সে তুমি তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাস করগে। আমি তার কী জানি।

মন — (চিন্তিত ভাবে) তাইত! তাইত! তাহলে মস্ত বড় একটা অন্যায় কাজ হয়ে গেল তো! তবে আমি না জেনে করে ফেলেছি।

সুমতি — বটে, তাই নাকি? লঙ্কা জেনে খেলেও ঝাল লাগে— আর না জেনে খেলেও ঝাল লাগে। লাগে কিনা?

মন — এ্যা— এ্যাঁ, তা লাগে বটে, ঝাল লাগে। আচ্ছা এর মীমাংসা আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক করব।

সুমতি — আচ্ছা তাই করো। এখন আমার কথার একটা জবাব দাও দিকি?

মন — কি, আমি শ্রমণ হয়ে নারীর সঙ্গে কিছুতেই কথা কইব না।

সুমতি — নারীর সঙ্গে তো আদপেই কথা কইছ না— সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পুরুষের ভেতর যে বোধিসত্ত্ব— সে বোধিসত্ত্ব বুঝি নারীর ভেতর নেই?

মন — বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে একথাটার একটা মীমাংসা করে নিতে হবে।

সুমতি — নারীর সঙ্গে কথা কওয়া নিষিদ্ধ, অতএব নারীর সঙ্গে তো আদপেই কথা কইছ না। আর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়— তাহলে তার জবাব হলো— বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তবে তার মীমাংসা করে নেবে। বেশ বেশ, তুমিই ঠিক শ্রমণ হয়েছ।

মন — ওসব তো আর মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নয়, মনুষ্যজীবনের উদ্দশ্য হলো বোধিসত্ত্ব লাভ করা।

সুমতি — বোধিসত্ত্ব লাভের পর কী করব?

মন — জীবজগতের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করবে। সেবার দ্বারায় জগতের তৃপ্তি সাধন করবে। (মাথায় পুঁটুলি লইয়া একটি প্রৌঢ়া রমণীর প্রবেশ)

প্রৌঢ়া — বাবা, ভারি তেষ্টা পেয়েছে। আমায় এক ঘটি জল দিতে পার বাবা?

মন — তুমি আগে বল— তুমি বেটাছেলে না মেয়েছেলে?

প্রৌঢ়া — সে কি গো বাবা। আমি মেয়েছেলে, আমি তোমার মেয়ে হই। আমায় জল দাও বাবা।

মন — ও তুমি মেয়েছেলে— তাহলে তো তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে তুমি সুমতির কাছে যাও। সে এখুনি তোমায় জল দেবে।

সুমতি — এস মা, খুব ঠাণ্ডা জল। আশ মিটিয়ে খাবে এস।

(সুমতির প্রৌঢ়াকে জল প্রদান এবং জলপান করিয়া প্রৌঢ়ার প্রস্থান)

মন — দেখ সুমতি, এই যে তৃষ্ণার্তকে জল দিলে— এ হলো সেবাধর্ম। বোধিসত্ত্ব বলেন, জীবে দয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সুমতি — আমি মেয়েছেলে, আবার আমার সঙ্গে কথা কইলে।

মন — হায় হায়, হায়, সুমতি ভু-ভু-ভুল হয়ে গেছে। মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে।

সুমতি — মনে রেখো আর যেন এরকম ভুল না হয়।

মন — তা, মনে রাখতে হবে বৈকি।

(দুইজন গ্রাম্য যুবকের কাঁধে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ)

১ম যুবক —শ্রমণ ঠাকুর, ইনি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে বড় জখম হয়েছেন।

মন — নিয়ে এসো বাবা, নিয়ে এসো। আমি প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি সেরে যাবে।

(মন অগ্রসর হইয়া পাত্রস্থ প্রলেপ লইয়া প্রৌঢ়ের আঘাত প্রাপ্ত স্থানে লাগাইয়া দিল)

প্রৌঢ় — আঃ বাবা, তোমাদের জয়জয়কার হোক, আমার সমস্ত যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল।

মন — প্রভু বোধিসত্ত্ব বলেন— জীবের কল্যাণ করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রৌঢ় — হ্যাঁ বাবা, বোধিসত্ত্ব এই নগরে এসেছেন, তাই তাঁকে দেখতে আসছিলাম। তা হঠাৎ পড়ে গেনু। আচ্ছা বাবা, আমরা আসি।

(গ্রাম্য যুবকদ্বয়ের সহিত প্রৌঢ়ের প্রস্থান। কতিপয় ছাত্রের প্রবেশ)

১ম ছাত্র — শ্রমণ ঠাকুর প্রণাম হই। আজ আমাদের অনধ্যায়, আমাদের ছুটির দিন। নগরে বোধিসত্ত্ব এসেছেন— আমরা তাঁকে দেখতে যাব।

মন — বোধিসত্ত্ব এসেছেন! যাও, তোমাদের ছুটি, বোধিসত্ত্ব দর্শন করে কৃতার্থ হওগে!

২য় ছাত্র — আচ্ছা শ্রমণ ঠাকুর, আমরা প্রণাম হই। (ছাত্রগণের প্রস্থান)

মন — দেখ সুমতি, প্রভু বোধিসত্ত্ব বলেন— জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান।

সুমতি — আবার মেয়েছেলের সঙ্গে কথা!

মন — (সুমতির হাত ধরিয়া) তুই চলে আয় সুমতি। প্রভু বোধিসত্ত্ব নগরে এসেছেন, আজ এর একটা মীমাংসা করে তবে ছাড়ব।

(সুমতির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মনের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

(স্থান— ধনপতি শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদের সম্মুখ। বৌদ্ধ শ্রমণ বেশে ধনপতি শ্রেষ্ঠী ও তাহার শিষ্য কল্পতরু।)

কল্পতরু — প্রভু, এই আপনার পূর্ব আবাস!

ধনপতি — হ্যাঁ বৎস, এইখানেই আমি ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তারপর ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত উল্কার মতন ছুটে বেড়িয়েছি। শেষে বোধিসত্ত্বের কৃপালাভ করে তবে আশ্বস্ত হয়েছি।

কল্পতরু — প্রভু, আজ্ঞা করুন, আজ আমরা এইখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করি।

ধনপতি — শ্রমণের সব গৃহই সমান। যেখানেই ভিক্ষা পাওয়া যাবে সেখানেই তা গ্রহণ করা যায়। বিচার নিষ্প্রয়োজন

কল্পতরু — (অগ্রসর হইয়া) গৃহস্থ, শ্রমণ ভিক্ষা চায়! তাদের ভিক্ষা দাও।

(রত্না, রাহুল ও শর্মিষ্ঠা বাহিরে আসিল)

রত্না — একি, একি, প্রভু! আজ যে সত্যকারের সুপ্রভাত! বোধিসত্ত্ব দ্বারে অতিথি! প্রভু, স্বামী, আর্যপুত্র— আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!

(রত্না ধনপতিকে প্রণাম করিল)

রাহুল — মা, তুমি বাবাকে বোধিসত্ত্ব বলছ কেন? তুমি বাবাকে ঠিক চিনতে পার নি?

রত্না — অনেকদিন পরে দেখলে প্রণাম করতে হয় রাহুল।

রাহুল — বাবা, বাবা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

শর্মিষ্ঠা — বাবা, আমিও প্রণাম করি।

(উভয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া ধনপতিকে প্রণাম করিল)

রত্না — রাহুল, পিতৃধনে পুত্রের অধিকার আছে। তুমি পিতার কাছ থেকে পিতৃধন ভিক্ষা করে নাও।

রাহুল — বাবা, বাবা, আমাকে পিতৃধন দাও।

ধনপতি — বৎস, আমি শ্রমণ,— জীবনে এই প্রব্রজ্যা অর্জন করেছি। এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে জগতের নরনারীর কল্যাণে নিযুক্ত হও।

(রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান)

রত্না — প্রভু, আমাকেও প্রব্রজ্যা দিন, আপনার কৃপালাভ করে আমিও কৃতার্থ হই।

শর্মিষ্ঠা — বাবা, বাবা, আমাকেও প্রব্রজ্যা দাও।

ধনপতি — সঙেঘর নিয়মে নারীর প্রব্রজ্যা গ্রহণ নিষিদ্ধ।

কল্পতরু — প্রভু, আজ আপনার সঙেঘর নিয়ম লঙঘন করে আমার তপস্যার অর্ধেক ফলদানে আমি এই মাতৃরূপা গুরুকন্যাকে প্রব্রজ্যা দান করব। আসুন মা, আসুন ভগ্নী, আমি আপনাদের প্রব্রজ্যা দান করছি।

রত্না — প্রভু, আজ্ঞা করুন।

শর্মিষ্ঠা — বাবা অনুমতি দাও।

ধনপতি — কল্পতরু, আজ সংঘে নারীকে স্থান দিয়ে সঙেঘর ভিত্তি দৃঢ়তর করলে। আমার আপত্তির কোন কারণ নেই। তোমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পার।

(বেগে মন ও সুমতির প্রবেশ)

মন — দেখলি সুমতি, প্রভু কেমন মীমাংসা করে দিয়েছেন?

সুমতি — ও রকম যে হবে, তা আমি জানি। জগতের অর্ধেক নর আর অর্ধেক নারী। সেই নারীকে সঙেঘ স্থান দিতে হবে তা আমি জানতাম।

(বোধিসত্ত্বের জয়, বোধিসত্ত্বের জয়, বোধিসত্ত্বের জয়— চিৎকার করিয়া নরনারীগণের প্রবেশ)

১ম নর — প্রভু, আমাদের প্রব্রজ্যা দিন। আমরা বোধিসত্ত্ব লাভ করে— ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি।

১ম নারী — প্রভু, আমাদেরও প্রব্রজ্যা দিন আর তার সঙ্গে আশীর্বাদ করুন— আমাদের বোধিসত্ত্ব লাভ হয়ে আমরা যেন ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাই।

ধনপতি — আমি আশীর্বাদ করছি— জগতের সমস্ত নরনারীর বোধিসত্ত্ব লাভ হোক। তারা ব্যাধি, জরা, ও মৃত্যুর ভয় থেকে পরিত্রাণ লাভ করুক, নরনারীর কল্যাণ হোক।

:: পটক্ষেপন ::

—সমাপ্ত—